মা ও মেয়ে।

(উপন্যাস)

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

"পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্ট-রক্ষিতং
গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে
গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

কলিকাতা;

১১ নং সিমলা ষ্ট্রীট্, ভবনস্থ

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১।

মা ও মেয়ে।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে ষষ্ঠীর দিন বেলা চারিটার সময় শরৎকুমারী তাহার জননী সুলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

'মা! বাবা কখন আসিবেন?'

সুলোচনা কন্যার বিশৃঙ্খল কেশরাশি সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া কহিলেন,—

'সন্ধ্যার পর। কেন, তুমি কি জান না, তিনি প্রতি বৎসর পূজার আগে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর বাটী আইসেন। এবারেও সেই সময় আসিবেন।'

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল,—

'বাবা আমার জন্য কি কাপড় আনিবেন মা? পাড়ার সকলেই নূতন কাপড় পরিয়াছে।'

'তোমারও সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে ভাল কাপড় আসিবে। তুমিও কালি প্রাতে কাপড় পরিয়া ঠাকুর দেখিতে যাইবে।'

বালিকা হাসিতে হাসিতে অন্য বিষয়ে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিল; সুলোচনা ভাবিতে লাগিলেন, 'সন্ধ্যার তো আর বিলম্ব নাই। তিনি ক্লান্ত হইয়া আসিতেছেন, আমি তাহার আহারের উদ্যোগ করিয়া রাখি।'

সুলোচনার স্বামীর নাম উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উমাচরণ কলিকাতায় একটী আফিসে কর্ম্ম করেন, মাসিক পঁচিশটী টাকা মাত্র বেতন পান। কায়ক্লেশে স্বীয় বাসা-খরচ নির্ব্বাহ করিয়া উমাচরণ প্রতিমাসে প্রায় পোনরটী টাকা সুলোচনার নিকট পাঠাইয়া দেন। সুলোচনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি সেই টাকা কয়টীতে আপনাদের খরচ চালাইয়া মাসে মাসে ২।৩ টী টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখেন এবং তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে কন্যা শরৎকুমারীর দুই এক-খানি অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দেন। এ সংসারে সুলোচনার স্বামী ভিন্ন আর কেহই নাই। নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই সুলোচনা পিতৃ-মাতৃ-হীনা।

সুলোচনা সুন্দরীর শিরোমণি। তাঁহার বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ। তাহার পরিণত দেহ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে ঢল্ ঢল্ করিতেছে। দারিদ্র্য বা দৈহিক শ্রম তাঁহার অপার আনন্দ নষ্ট করিতে পারে নাই, সুতরাং তদ্ধেতু তাহার সৌন্দর্য্যও অপচিত হয় নাই, বরং চিত্তের অযথা প্রসন্নতা হেতু তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও সমুজ্জ্বল হইয়া বিভাসিত হইত। তাঁহার চিত্ত-প্রসাদের দুইটী বলবৎ কারণ ছিল। প্রথমতঃ, তিনি দরিদ্রের কন্যা এবং দুরবস্থায় পালিতা ও বর্দ্ধিতা, সুতরাং দারিদ্র্য তাঁহার অনভ্যস্ত নহে, অথবা তাঁহার পক্ষে বিশেষ ক্লেশ-জনক নহে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার স্বামীর অপরিমেয় প্রেম। সেই অতুলনীয় প্রেমরাশি তাঁহার হৃদয়কে নিয়তই এমনই মাতাইয়া রাখিত যে, তুচ্ছ সাংসারিক চিন্তা সে পবিত্র চিত্তে স্থান পাইত না। আমরা এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া সুলোচনাকে অনেক রাজরাণীর অপেক্ষা সুখশালিনী ও সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করি।

তাঁহার স্বামী রূপবান, জ্ঞানবান এবং বিদ্বান। তাহার পর, মানুষ মানুষকে যত দূর ভালবাসিতে পারে তিনি সুলোচনাকে ততদূরই ভালবাসিয়া থাকেন। তবে আর এ জগতে সুলোচনার চাই কি? সুলোচনা স্বামীর সন্তোষ ও সুখই এক মাত্র ব্রত জানিয়া পরমানন্দে জীবন পাত করিতেছেন।

শরৎকুমারী উমাচরণ ও সুলোচনার একমাত্র তনয়া। এক্ষণে তাহার বয়স অষ্টম বর্ষ। বালিকার দেহ নিরুপম শ্রীতে পূর্ণ। তাহার বর্ণ চম্পকের ন্যায়। দেহের গঠন সুগোল ও সুকুমার। রাশি রাশি ঘন কৃষ্ণ কেশকলাপে পৃষ্ঠদেশ সমাবৃত। নেত্রদ্বয় বিশাল, উজ্জ্বল ও স্থির। সুলোচনা গৃহকর্ম সমাপ্তির পর অবকাশ-কালে যত্ন সহকারে শরৎকুমারীকে লেখা পড়া শিখাইতেন। বুদ্ধিমতী শরৎকুমারী এই অল্প বয়সে যতদূর শিখিতে পারা যায় তাহা শিক্ষা করিয়াছেন।

সুলোচনা উমাচরণের নিমিত্ত আহারাদির উদ্যোগ করিয়া রাখিলেন। তাহার পর সুখ শান্তির নিমিত্ত যাহা যাহা প্রয়োজন হইতে পারে তাহা সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিলেন। তাহার পর সানন্দে স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল; উমাচরণ আসিলেন না। শরৎকুমারী ব্যাকুল-ভাবে জিজ্ঞাসিল,—

'কই মা, বাবা এখনও আসিলেন না তো?'

সুলোচনার মনের ব্যাকুলতা শরৎকুমারীর অপেক্ষা অনেক অধিক, তথাপি তিনি আত্ম-ব্যাকুলতা গোপন করিয়া বলিলেন,—

হয়ত গাড়ি পান নাই বলিয়া আসিতেছেন না। নয়ত এখনও কাজ মিটে নাই। যাহাই হউক আসিবেন এখনই।'

তখনই বাহিরের দ্বারে অঘাত শব্দ হইল এবং মানব-কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ উঠিল। সুলোচনা ব্যস্ততা সহ বাহিরে আসিলেন, শরৎকুমারীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এক জন লোক ডাকিয়া বলিল,—

'মা ঠাকুরাণি, দরজা খোল, বাবু আসিয়াছেন।'

সুলোচনা ব্যস্ততা সহ গিয়া দরজা খুলিলেন। তাঁহার পশ্চাতে শরৎকুমারী। দরজা খুলিয়া দেখিলেন, একখানি পাল্কীর মধ্যে উমাচরণ শয়ান। তিনি উত্থান শক্তি বিরহিত। সুলোচনাকে দেখিবা মাত্র উমাচরণ বলিলেন,—

'বড় পীড়া—আমাকে ঘরে লইয়া চল।'

শরৎকুমারী এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুলোচনা পাল্কীর মধ্যে হস্তদ্বয় দিয়া উমাচরণকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। উমাচরণ উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর সুলোচনা একজন বাহককে উমাচরণের এক দিকের বাহু ধরিতে বলিলেন এবং শরৎকুমারীকে পাল্কীর মধ্যস্থ অন্যান্য সামগ্রী লইয়া আসিতে বলিলেন। উমাচরণকে শয্যায় শয়ন করাইলেন। উমাচরণ ব্যাগের চাবি সুলোচনাকে দিলেন, সুলোচনা তন্মধ্য হইতে টাকা পয়সা বহির করিয়া বাহকদিগকে দিয়া বিদায় করিলেন। তাহার পর তিনি বাষ্পাকুল লোচনে স্বামীর পদদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন এবং শরৎকুমারী পিতার মস্তক সমীপে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সুলোচনা স্বামীর মুখে পীড়ার বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিলেন যে, অদ্য রাত্রেই চিকিৎসা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। গ্রামে একজন মাত্র ডাক্তারের বাস। তাঁহার নাম রামচরণ ডাক্তার। রামচরণ ডাক্তার চিকিৎসাবিদ্যা কখন অভ্যাস করেন নাই। তিনি ইংরাজি ভাষার Second Book of Reading পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালাতেও দুই এক খানা বটতলা অঞ্চলের অপূর্ব্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তদনুযায়ী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল মহাকার্য্য সাধিত করিয়া রামচরণ ডাক্তার আপনাকে একজন প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতবিদ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন, অন্য কোনরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া জানিলেন না। যখন জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অর্থোপার্জ্জন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন

রামচরণ চিকিৎসা ব্যবসায়কে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ মনে করিয়া তাহাই অবলম্বন করিতে সংকল্প করিলেন। চিকিৎসা কার্য্যে তিনি যে সক্ষম, তাহা তাহার মীমাংসা করিবার কতকগুলি হেতু ছিল। অর্থের প্রয়োজনীয়তা যখন তাঁহাকে নিতান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল, তখন রামচরণ চাকরির চেষ্টায় কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া রামচরণ যাহাদের বাসায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। রামচরণ দেখিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বাসায় বসিয়া মরার হাড় লইয়া নাড়াচাড়া করে। যখন বাসায় কেহ না থাকিত, তখন রামচরণ বলবান করিয়া, ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়া দুই এক দিন ঐ সকল অস্থিরাশিতে নির্ব্বিঘ্নে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার পর মীমাংসা করিলেন, এই তো ডাক্তারি, ইহাতে আর ভয় কি?' রামচরণ স্থির করিলেন ডাক্তারি ব্যবসায়ই ভাল। অতএব ডাক্তারি করাই রামচরণের মত হইল। তাহার পর ছাত্রবর্গকে ডাক্তারি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ২। ৪টী ঔষধের নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন এবং একখানি বাঙ্গালা প্রেস্কৃপ্সন্-বুক সঙ্গে লইয়া রামচরণ ডাক্তার রূপনগরে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। রূপনগরে রামচরণ অল্পদিনেই বিলক্ষণ পসার জমাইয়া লইলেন। যে রোগী রামচরণের হাতে পড়িয়াও জীবন লাভ করিত, রামচরণ বুক বাজাইয়া বলিতেন,—"এ রোগ কি সারে?—আমার যেই অনেক শিক্ষা—অনেক সন্ধান, তাই ওকে বাঁচাইতে পারা গেল।" যেটী মরে, রামচরণ তাহার সম্বন্ধে বলেন —"উহার যে ব্যাধি হইয়াছিল তাহা অসাধ্য, একথা আমাদের ফারমাকোপিয়ায় স্পষ্ট লেখা আছে। সেই দিনই মরিত, আমি যাই তাই তিন দিন রাখিয়াছিলাম।" অধিকাংশ রোগীই রামচরণের প্রসাদাৎ অকালে ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। কিন্তু রামচরণের বিদ্যাবুদ্ধি যেমনই হউক, তাঁহার পসার ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তিনি রূপনগর বঙ্গবিদ্যালয়ের

সম্পাদক, ট্যাক্সের কর্ত্তা, চৌকিদারগণের মা বাপ, সেন্সসের সুপার-ভাইজর, ইত্যাদি ইত্যাদি। রামচরণ জানিতেন যে, ডাক্তার হইলেই এক একটু সুরাপান করা আবশ্যক। ফলতঃ এই বিদ্যাই যদি ডাক্তারির পরিচায়ক হয় তাহা হইলে রামচরণকে কম ডাক্তার বলা যায় না। কারণ রামচরণ প্রগাঢ় সাধনা হেতু এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই রামচরণ ডাক্তার ভিন্ন রূপনগরের আর গতি নাই। সুলোচনা সেই রাত্রেই রাম-চরণ ডাক্তারকে ডাকা স্থির করিলেন। কিন্তু গোলের কথা— কে সে রাত্রে রামচরণ ডাক্তারকে ডাকিতে যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুলোচনা একখানি পত্র লিখিলেনন। লিখিলেন,—

"মহাশয়,

আমার বড় কঠিন পীড়া হইয়াছে। অতএব অদ্য রাত্রেই মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রবাহকের সহিত আমার বাটীতে আসিবেন। বিলম্ব হইলে অনিষ্ট হইতে পারে, অতএব দয়া করিয়া রাত্রেই আসিবেন। ইতি।

অনুগত

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

তাহার পর একজন প্রতিবাসী ইতর লোককে ডাকিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার দ্বারা যথাস্থানে পত্র প্রেরণ করিলেন। সুলোচনাকে পল্লীস্থ সকলেই বড় ভালবাসে। সুলোচনার অবস্থা মন্দ বটে, তথাপি তিনি দীন দরিদ্র প্রতিবেশিগণকে কখনও বা অন্নের দ্বারা, কখন বা একখানি জীর্ণ বস্ত্রের দ্বারা, কখন বা দুই একটী পয়সার দ্বারা নিয়তই সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং পার্শ্বস্থ দরিদ্রগণ তাঁহাকে বড় ভালবাসে এবং সকলেই তাঁহাকে অতি আত্মীয় বলিয়া মনে করে। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোক, সুলোচনা তাহাদের বিপদে, বা সম্পদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তাহাদের জন্য শারীরিক শ্রম করিয়া এবং সততই সকলের সহিত

মিষ্ট কথা কহিয়া ও নিয়ত সকলের কল্যাণ ও হিতান্বেষণ করিয়া সকলেরই বিশেষ অনুগ্রহ ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন।

সুলোচনা সে রাত্রে আর কাহাকেও তাঁহার বিপদের কথা জানাইলেন না। ভাবিলেন, এক্ষণে সকলকে সম্বাদ দেওয়া অপেক্ষা যথাসম্ভব চিকিৎসার আয়োজন করাই সৎপরামর্শ। সুলোচনা পত্র বাহককে বিদায় করিয়া আবার স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন,—উমাচরণ এক একটী সম্বন্ধ-শূন্য, অর্থ-রহিত বাক্য বলিতেছেন। সুলোচনা বিশেষ করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীকে তাহার বর্ত্তমান অসুখের কথা জিজ্ঞাসিলেন। কিন্তু কোনই সদুত্তর পাইলেন না। শরৎকুমারী পিতার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া, 'বাবা! বাবা!' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুলোচনা তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—

'ভয় কি? এখনই ডাক্তার আসিয়া সকল রোগ ভাল করিয়া দিবে। ভয় কি?'

সুলোচনা অতিকষ্টে আত্ম-হৃদয়ের যৎপরোনাস্তি যাতনা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দুহিতাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের তদানীন্তন অবস্থা কে বুঝিবে?

ক্রমে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। সুলোচনা রামচরণ ডাক্তারের জন্য ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার হয়ত আসিবেন না ভাবিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন এতাদৃশী অবস্থায় পীড়িতের অপেক্ষা বহুক্ষণে যাতনা ভোগ করিতেছেন; সেই সময়ে বাহিরের দ্বারে পদাঘাত শব্দ হইল। তিনি বেগে সেইদিকে ধাবিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—

'কে?'

উত্তর হইল,—

'মা ঠাকুরাণি, ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।'

সুলোচনা দৌড়িয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। গ্রামের মধ্যে

যাঁহারা পরমাত্মীয় কেবল তাঁহারাই সুলোচনার মুখ দেখিতে পাই যাছেন, তদ্ভিন্ন আর কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই, বা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে নাই। কিন্তু অদ্য সুলোচনা যে বিপদে পতিত, তাহাতে তিনি যাহা কখন করেন নাই, তাহাও অদ্য করিতে হইল। তিনি রামচরণ ডাক্তারকে 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রামচরণ ডাক্তারের সহিত একজন ভৃত্য লণ্ঠন ধরিয়া আসিয়াছিল। রামচরণ বাটীর ভিতর অন্ধকার দেখিয়া লণ্ঠন-বাহককে সেই দিকে লণ্ঠন আনিতে আদেশ করিলেন। লণ্ঠন আসিলে তাহার আলোকে রামচরণ একবার সুলোচনার বদনের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে সে পাপর নয়ন আর সেদিক হইতে ফিরিতে চাহিল না। রামচরণ কি করিতে আসিয়াছেন, কোথায় বা আসি যাছেন, সকলই ভুলিয়া গেলেন। সুলোচনার ভুবনমোহিনী মাধুরী তখন তাঁহার চিত্তকে এককালে মোহিত করিয়া ফেলিযাছে। তিনি সেই স্থলে সেই লাবণ্যময়ীর বদনের প্রতি চাহিয়া সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সুলোচনা বলিলেন,—

'মহাশয়, আমার স্বামী—বোধ করি, তাঁহার সহিত আপনার পরিচয় আছে, আজি বড় পীড়িত হইয়া কলিকাতা হইতে বাটী আসি-য়াছেন। তাহাকে দেখিবার নিমিত্তই মহাশয়কে ডাকা হইয়াছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া যাহাতে তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠেন, তাহার উপায় করিয়া আমাদের সকলকে প্রাণদান করুন।

রামচরণ ডাক্তার একটু সুরাপান করিয়াছিলেন, মস্তিষ্ক স্বাধীন ছিল না; সুতরাং কথাবার্ত্তার গ্রন্থি ছিল না। বলিলেন,—

'তা—হাঁ—তা—চল। তুমি ভাব কিসের? তোমার আবার ভাবনা? চল চল।'

লণ্ঠন-বাহক ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত লণ্ঠন লইয়া চলিল। তাহার পরে অগ্রে সুলোচনা পশ্চাতে ডাক্তার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের ভিতর একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল,

সুলোচনা তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার রোগীর প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া সুলোচনার কমনীয় কান্তি সন্দর্শনে নিবিষ্ট রহিলেন। তখন রোগী একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সুলোচনা ব্যস্তে রোগীর শয্যা-সমীপস্থ হইয়া ডাক্তারকে রোগীর অবস্থা দেখিতে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'ইহার কি ব্যারাম হইয়াছে?'

সুলোচনা বলিলেন,—

'কি হইয়াছে, আপনি দেখুন।' এই বলিয়া সুলোচনা যেমন যেমন শুনিয়া ছিলেন ও এখন যেমন যেমন দেখিতেছেন, সমস্তই বলিলেন। ডাক্তার সে সকল কথার একটীতেও কর্ণপাত করেন নাই। তিনি অনিমিষ নয়নে সুন্দরীর মুখপানে চাহিয়া ছিলেন এবং তদ্গত চিত্তে তাঁহার মনোহর ভঙ্গী সন্দর্শন করিতেছিলেন। সুলোচনার কথা সমাপ্ত হইল—তথাপি ডাক্তার রোগীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন না। তখন সুলোচনা তাঁহাকে রোগীর অবস্থা পরীক্ষা ও উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন,—

'তাহার জন্য চিন্তা কি? তুমি বলিলে মরিতে পারি। রোগী দেখিতে হইবে? কই দেখি—উমাচরণ, আমাকে হাত দেও।'

কিন্তু উমাচরণ বাবু তো অজ্ঞান, হাত দিবে কে? রামচরণ সুলোচনাকে বলিলেন,—

'তোমার হাত দেখি।'

সুলোচনা বলিলেন,—

'সে কি কথা? আমার হাতে কি দেখিবেন?'

রামচরণ হাসিয়া বলিলেন,—

'তাতে দোষ কি? স্বামী স্ত্রীতে একই। তোমার হাতে কত কি আছে।'

রামচরণ সুলোচনার গম্ভীর ও কাতর বদনের প্রতি চাহিলেন। চিন্তায় এবং ডাক্তারের এবম্বিধ বিসদৃশ ব্যবহারে সুলোচনা বড়ই কাতর হইলেন; কিন্তু কি করেন, তখন আর উপায়ান্তর নাই। তখন সেই ডাক্তারের হস্তেই তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছে। তিনি সেই জন্যই সমস্ত অসদ্ব্যবহার উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহার হস্তোত্তোলন করিয়া ধরিলেন এবং ডাক্তারকে দেখিতে বলিলেন। তখন সেই নব-কুল-গ্লানি রামচরণ রোগীর হস্তে হস্তার্পণ না করিয়া সুলোচনার সেই নবনীত বিনিন্দিত কোমল বাহু-লতা ধারণ করিল। তখন সেই ব্যথিতা, অপমানিতা, উৎকণ্ঠিতা সাধ্বী সজোরে স্বীয় হস্ত ঐ পাষণ্ডের হস্ত-নির্ম্মুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলেন।

হায়! এ সংসারে মানবের মনোবৃত্তির কি বিভিন্নতা! একজন যে কারণে ঘোর চিন্তায় আকুল, আর একজন সেই কারণেই স্বীয় ঘৃণিত মনোবৃত্তি সাধনের বিশেষ অনুকূল বোধে তৎসাধনে সচেষ্টিত। ইহারা উভয়েই কি মনুষ্য? মনুষ্য-সমাজ এতাদৃশ বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিদ্বয়কে যদি একই নামে সম্বোধন করিতে পারে, তবে শৃগাল, ভল্লুক, সর্প প্রভৃতি জীবেরাও মনুষ্য নহে কেন? বরং তাহারাও মনুষ্যপদ বাচ্য হইতে পারে, কারণ তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরপরাধ। তাহারা যাহা করে তাহার শুভাশুভ বা হিতাহিত চিন্তার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কিন্তু তুমি, আমি বা রামচরণ বা দস্যু বা হত্যাকারী যাহা করি বা করে, তাহার ফলাফল পরিণাম সকলই আমরা জানি ও বুঝি। তথাপি আমরা যদি অযোগ্য কার্য্য হইতে নিরস্ত না হই তাহা হইলে অবশ্যই আমরা শৃগাল, ভল্লুক, সর্পপ্রভৃতি জীবাপেক্ষা নিকৃষ্টতর জীব, তাহার সন্দেহ নাই।

রামচরণ সুলোচনার বিরক্তি দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন।

বলিলেন,—

"কি বলিলে? কখন হইতে পীড়া হইয়াছে?'

সুলোচনা আবার সমস্ত কথা বলিলেন। রামচরণ কোন্ রোগের সন্দেহে কোন্ কোন্ লক্ষণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার কিছুই জানিতেন না। সুতরাং একবার হাত দেখিয়া, একবার রোগীর কপালে হাত দিয়া এবং একবার পেট টিপিয়া যাহা হয় একটা সিদ্ধান্ত করিলেন। স্থির করিলেন, রোগীকে কল্যই 'ক্যাষ্টর অয়েল' দেওয়া আবশ্যক। তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন এবং সুলোচনাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—

'আমি এখনই ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই ঔষধ অদ্য শেষ রাত্রে রোগীকে খাওয়াইয়া দিবে। বেলা ৮টার সময় রোগী প্রায় সারিয়া যাইবে। আমি আবার সেই সময়ে আসিয়া আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া দিব।'

সুলোচনা সানন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর রামচরণ ডাক্তার বলিলেন,—

'তোমার কোন ভয় নাই। আমি আবার কালি সকালে আসিব, এক্ষণে বিদায় হই।'

অদ্য আর অধিক বাড়াবাড়ি করা রামচরণ ডাক্তার যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। এই জন্যই উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিলে সুলোচনা তাঁহার হস্তে একটী টাকা দিয়া বলিলেন,—

'কালি আসিতে ভুলিবেন না। যাহাতে উনি ত্বরায় ভাল হইয়া উঠেন তাহার উপায় করিবেন।'

রামচরণ টাকাটী সুলোচনাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—

'তোমার নিকট হইতে টাকা লইব? ছি! তোমার একটা কথার দাম লক্ষ টাকা! আবার টাকা কি?"

সুলোচনা অধোবদনে বলিলেন,—

'আপনি আমার সহিত ওরূপ কথা কহিতেছেন কেন? আমরা গরিব, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের ঘৃণা করিবেন না।'

রামচরণ বলিলেন,—

'তুমি গরিব? তুমি যদি গরিব, তবে ধনী কে? আমরা তোমার চরণ সেবা করিতে পাইলেও জন্ম সার্থক মনে করি।'

সুলোচনা কথা কহিলেন না। সুলোচনা কেবল দায়ে পড়িয়াই তাহাকে পদাঘাতে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিলেন না। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে রামচরণ ডাক্তার লণ্ঠন-বাহকের সহিত প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—

'আমি এখনই নিজের লোক দিয়া ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি।'—

রামচরণ ডাক্তার চলিয়া গেলে সুলোচনা দরজা বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরৎকুমারী মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

'মা! তুমি যে বলিযাছিলে, ডাক্তার আসিলেই বাবা সারিয়া উঠিবেন। তা ডাক্তার তো চলিয়া গেলেন, কই বাবা তো এখনও সারিলেন না?'

সুলোচনা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—

'বাছা! মানুষের সহায় ঈশ্বর। মানুষ যাহা না পারে, ঈশ্বর তাহা অনায়াসেই পারেন। তুমি একমনে ঈশ্বরকে ডাক, তিনিই ভাল করিয়া দিবেন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি সুলোচনা ও শরৎকুমারী রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কাটাইলেন। বার বার সুলোচনা শরৎকুমারীকে ঘুমাইতে বলিলেন; পিতৃ-গতপ্রাণা বালিকা ঘুমাইবে কিরূপে? সে অক্লান্তে ভাবে পিতার মস্তক সমীপে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শেষ রাত্রে ডাক্তারের ঔষধ সেবন করাইয়া দেওয়া হইল।

প্রাতে সুলোচনা পল্লীস্থ সকলের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সে পল্লীতে অনেকগুলি সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। প্রবীণা স্ত্রীলোকেরা এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধেরা একে একে উমাচরণের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরুষগণের মধ্যে কেহ বা শাস্ত্রব্যবসায়ী, কেহ বা যাজক, কেহ বা অধ্যাপক, কেহ বা বাঙ্গালা মুহুরী, কেহ বা ব্যবসায়ী। তাঁহারা কেহই চিকিৎসাবিদ্যার কিছুই বুঝিতেন না। গ্রাম সম্পর্কে তাঁহারা কেহ বা সুলোচনার খুড়-শ্বশুর, কেহ বা জেঠশ্বশুর, কেহ বা ভাসুর হইতেন।

সুলোচনা সমবেত স্ত্রীগণের দ্বারায় পুরুষগণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাঁহারা সকলে রোগীর অবস্থা দেখিয়া ও সমস্ত কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নানারূপ জল্পনা করিলেন কিন্তু কোনই বিশেষ মীমাংসা করিতে পারিলেন না। যাঁহার যাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁহারা সকলে প্রস্থান করিলেন, অপর সকলে রামচরণ বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে রামচরণ ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা ৮টা।

ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, রোগীর অবস্থা অদ্য অনেক ভাল। বস্তুতঃ, উমাচরণ অদ্য আর অজ্ঞান নহেন এবং ক্ষণে ক্ষণে সেরূপ প্রলাপ বলিতেছেন না। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শয্যা হইতে

উঠিতে অক্ষম বটে, তথাপি তাঁহাকে আজ দেখিলে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়াই বোধ হয়। রামচরণ রোগীকে দেখিতে দেখিতে এক এক বার সুলোচনার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্য তাঁহার, সুলোচনাকে গত রাত্রির ন্যায় কোনরূপ রসিকতার কথা বলিবার সুযোগ হইল না। কারণ, অদ্য সেই ক্ষুদ্র ঘরে অনেক লোক। রামচরণ, পাপ লোকগুলা যায় না কেন, বলিয়া মনে মনে তাহাদিগকে বিস্তর গালি দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের এবম্বিধ আত্মীয়তায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইতে লাগিলেন। যদি লোক-গুলা ত্বরায় চলিয়া যায় ভাবিয়া, রামচরণ ডাক্তার নানা প্রসঙ্গে অনেক বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কতক লোক আর অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া চলিয়া গেল। কতক লোক বিশেষ কোন কাজ না থাকায় বসিয়া রহিল। রামচরণ ডাক্তার রোগীর সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং অদ্য পুন রায় ঔষধ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রোগী রামচরণকে নানা প্রকার শিষ্টাচার দ্বারায় তুষ্ট করিলেন, রামচরণও তাঁহার সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিলেন। পাঁচরকমে অনেকই বিলম্ব হইল, কিন্তু তবুও হতভাগিনী প্রতিবাসিনীরা মরিতে লাগিল। তাহা-দের কি বাড়ী ঘর নাই? তাহাদের কি মরিবার আর স্থান নাই? রামচরণ যখন বুঝিলেন যে, পাড়ার সর্ব্বনাশীরা এই খানেই মরিবে, তখন অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে সুলোচনার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি-পাত করিয়া প্রস্থান করিলেন। রামচরণ ডাক্তার গমন করার পর একে একে পল্লীবাসিনী আত্মীয়ারাও চলিয়া গেলেন।

সুলোচনা স্বামীর পথ্যের আয়োজন করিতে গেলেন। শরৎ-কুমারী পিতার নিকট বসিয়া রহিল। উমাচরণ তখন ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—

'পাগ্‌লি! কোথায় আছিস্?'

শরৎকুমারী বলিল,—

'কি বাবা, আমি তোমার কাছেই আছি।'

উমাচরণ সস্নেহে কন্যার হস্তে স্বীয় হস্তার্পণ করিলেন। শরৎ পিতার বাহুতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শরৎকুমারী বলিল,

'বাবা, কালি তুমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলে, কথা কহিতে পার নাই, তোমার বড়ই কষ্ট হয়েছিল,—নয় বাবা?'

উমাচরণ বলিলেন,—

'আমার জন্য কি তোমার কালি বড়ই ভাবনা হইয়াছিল?'

শরৎ কথা দ্বারা ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার নয়ন হইতে দুই ফোটা অশ্রু উমাচরণের হস্তে আসিয়া পড়িল।

উমাচরণ বলিলেন,—

'ভয় কি, ভাবনা কি? চিরদিন তো কেহ বাঁচে না। আমার কঠিন ব্যারাম হইয়াছে, আমি যদি মরিয়া যাই, তাহার জন্য তুমি কাঁদিবে কেন? কাঁদিলে তো মরা মানুষ ফেরে না।'

শরৎকুমারীর চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল এবং সে রোদন-বিজড়িত স্বরে বলিল,—

'বাবা, বাবা, তুমি ও কথা বলিও না। তোমাকে ছাড়িয়া কে থাকিতে পারে?'

উমাচরণ আবার বলিলেন,—

'কেন শরৎ, লোকের বাপ মা কখন কি চিরদিন থাকে? আমারও বাপ মা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই নাই।'

শরৎকুমারী বলিল,

'বাবা, লোকের কথা বলিও না। লোকের যাহা হয় হউক, আমার বাবা চিরদিনই থাকিবেন।'

এই সময়ে রামচরণ ডাক্তারের প্রেরিত ঔষধ আসিয়া পৌঁছিল। সুলোচনা ঔষধ হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

'ওকি, কাঁদিতেছ কেন?'

শরৎ উত্তর দিল না।

উমাচরণ বলিলেন,

'সংসারে সকলেরই বাবা মরে বটে, কিন্তু শরৎ উহার বাবাকে মরিতে দিতে চায় না।'

সুলোচনা বলিলেন,

'ভালই তো। আমার মেয়ে কি না; আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরই দরিদ্রের সহায়। তিনি দয়াসিন্ধু—তিনি সকলের বাসনাই সফল করেন।'

কথা সমাপ্তির পর সুলোচনা সিসি হইতে ঔষধ ঢালিয়া উমাচরণের নিকট লইয়া গেলেন। উমাচরণ ঔষধ খাইয়া বলিলেন,—

'ঈশ্বরই সকলেরই সহায় সত্য। কিন্তু মৃত্যু তো ঈশ্বরেরই বিধি। ঈশ্বরের বিধি কখনই অন্যথা হয় না। অতএব মৃত্যুর নিমিত্ত সকলেরই প্রস্তুত থাকা উচিত।'

সুলোচনা বলিলেন,

'মৃত্যু হইবে জানিয়া সংসার শুদ্ধ লোক নিশ্চিন্ত থাকুক, কিন্তু আমি, মৃত্যু হইবে না জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিব।'

উমাচরণের বদনে হাসি আসিল। বলিলেন,

'কথাটী শরৎকুমারীর জননীর অনুরূপ হইয়াছে বটে।'

সুলোচনা বলিলেন,

'কেন? তুমি কি আমাকে সংসারে সকল লোকের সহিত সমান বলিয়া মনে কর? আমি কিসে লোকের সহিত সমান? এ জগতে কাহার স্বামী আমার স্বামীর ন্যায় গুণবান্ ও সচ্চরিত্র? কাহার স্বামী স্ত্রীকে এমন করিয়া ভাল বাসে? কোন্ স্বামী আপন সামান্য অবস্থা উপেক্ষা করিয়া পরিবার মধ্যে এমন সুখের রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে? সংসারের কোন্ রাজরাণীর সুখ আমার সুখের সমান? সংসারের কাহার সহিত আমার তুলনা শোভা পায়?

যাহার প্রতি বিধাতা এত সদয়, যাহার সুখ সৌভাগ্য অতুলনীয়, সংসারের সাধারণ নিয়ম তাহার পক্ষে কখনই খাটিবে না। তুমি আমাকে সংসারের নিয়মানুসারে প্রস্তুত থাকিতে বলিও না। আমি সে নিয়মের অধীন নহি। আমি জানি, আমার সংসারের স্বতন্ত্র নিয়ম আছে।'

এই বলিয়া সেই পতি-প্রেম-গর্ব্বিতা কামিনী কুল-কমলিনী সুলোচনা স্বামীর ললাটে যে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বহিতেছিল, তাহা অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিলেন। উমাচরণ কোন উত্তর করিলেন না। সেই অতুলনীয় প্রেম-প্রবাহ যেন সেইরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিতে করিতে চিরদিন প্রবাহিত হইতে পারে বলিয়া তিনি ঈশ্বর সমীপে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন। সংসারের বিপদ-বাত্যায় বা কালের কঠোর আক্রমণে সেই রমণীর সুখের প্রাসাদ বিচূর্ণিত হইয়া না যায় বলিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন। তাহার নয়ন-প্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

দুই ঘণ্টা অন্তর এক একবার ঔষধ খাওয়াইবার আদেশ ছিল। সুলোচনা ঠিক নিয়ম মত ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমস্ত দিন উমাচরণ ভালই থাকিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে একটা অভিনব উপসর্গ আসিয়া জুটিল। প্রথমে বিন্দু বিন্দু করিয়া কপালে, পরে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম-প্রবাহ বহিতে লাগিল। এই উপসর্গে উমাচরণ আরও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ বরফের ন্যায় শীতল হইয়া উঠিল। সুলোচনা প্রতিবাসিগণকে ব্যস্ততা সহ এই বিপদের কথা জানাইয়া আসিলেন। দুই একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা

দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহা নিতান্ত কুলক্ষণ। রাত্রি যখন ৮টা, তখন ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন প্রবীণ প্রতিবাসী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং রোগীর অবস্থা বিশেষ সাবধানতা সহকারে দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রামচরণ রোগীকে দেখিয়া বলিলেন,—

"বাঃ। ইনি তো ভালই আছেন। তবে আর কি? কল্য প্রাতে দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিব।"

এই বলিয়া রামচরণ সুলোচনার দিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, সুলোচনা চেতনাহীন পুত্তলীর ন্যায় স্বামীর অর্দ্ধমুকুলিত নয়ন ও স্থির বদনের প্রতি চাহিয়া আছেন।

রামচরণ বলিলেন,—

"উমাচরণ বাবু তো সারিয়া গেলেন, কিন্তু তুমি এখনও কাতর কেন?"

সুলোচনা কোন উত্তর দিলেন না। তিনি এরূপ ঘটনা ও এতাদৃশ অবস্থা আরও দুই এক রোগীর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের যে পরিণাম ঘটিয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতেন। সেই জন্যই তিনি কোন উত্তর দিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, আমার কিসের ভয়। মনুষ্য প্রাণে যতটুকু সহে ততটুকু সহিব। তাহার পর উপায় তো আমার হাত;

রামচরণ ডাক্তার সুলোচনার সহিত কোনরূপ প্রকাশ্য কথাবার্ত্তা হওয়া অসম্ভব দেখিয়া ভাবিলেন, নয়নে নয়নে দুই একটা মনের কথা সারিয়া লওয়া যাউক। এই ভাবিয়া আত্মনয়নকে তদুদ্দেশে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে নয়নের সহিত এ নয়নের একবারও সাক্ষাৎ হইল না। অনেক চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া রামচরণ ডাক্তার অগত্যা বাহিরে আসিলেন। তথায় দীননাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন প্রবীণ প্রতিবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেমন দেখিলেন ?"

রামচরণ বলিলেন,—

"বেশ। শরীর উত্তম শীতল। জ্বরের লেশ নাই। রোগী আরোগ্য হইয়া গিয়াছে আর কি ?"

প্রতিবাসী বলিলেন,—

"সেকি মহাশয়, এত ঘাম, এমন গা ঠাণ্ডা, এমন অজ্ঞান ভাব—এ সকল কি কুলক্ষণ নয় ?"

রামচরণ বলিলেন,—

"কি গ্রহ। আপনি যাহা বলিতেছেন—সে বিকার—২০। ২৫ দিন ভোগের পর এ সকল হইলে তাহাকে কুলক্ষণ বলা যায়। একদিনের জ্বরে এ সকল লক্ষণ হইলে তাহা সুলক্ষণ, কুলক্ষণ নয়।"

দীননাথ বলিলেন,—

"আপনি ডাক্তার, অনেক দেখিয়াছেন, অনেক জানেন, সুতরাং আপনি যাহা বলিতেছেন তাহার উপর কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের যেন মনে হইতেছে, গতিক ভাল নয়।"

রামচরণ হাসিয়া বলিলেন,—

"ভাল দেখা যাউক, গতিক কি হয়। যদি কোন খারাপ লক্ষণ দেখ, আমাকে সংবাদ দিও। আমি রাত্রি ৮টার সময় আবার আসিব।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাহার পর সেই প্রবীণ প্রতিবাসী আবার একবার বাটীর ভিতর গেলেন। রোগীর সমস্ত অবস্থা তিনি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় একজন বৃদ্ধা প্রতিবাসিনী তাঁহার সঙ্গে আসিল।

প্রতিবাসিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি দেখিলেন ?"

চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"বড় মন্দ। বোধ করি অদ্য রাত্রি আর কাটিবে না।'

প্রতিবাসিনীর নেত্র জল-ভারাকুল হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"এমন সোণার কার্ত্তিক, এমন মিষ্ট কথা, এমন ভাল স্বভাব, মানুষের আর হবে না। মেয়েটা—বউটা, আহা, কোথায় ভাসিয়া যাইবে!"

প্রতিবাসী বলিলেন,—

"বিধাতার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। তোমরা তিন চারি জন আজ সমস্ত দিন বাটী যাইও না, নিয়ত এখানেই থাকিও। আমিও আজি গৃহত্যাগ করিব না। বাটী হইতে আহার করিয়া এখনই আসিতেছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুলোচনা স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমতী—তাঁহার বিপদের পরিমাণ কত তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নাই। কিন্তু আশা মানুষকে প্রকৃত কথা বুঝিয়াও বুঝিতে দেয় না। আশা মধুর স্বরে সুলোচনার কর্ণে কত কথাই কহিতেছে, তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়কে শান্ত করিতেছে, এবং তাঁহার জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া দিতেছে। হায়! জগতে আশার আশ্বাস সময়-বিশেষেও যদি সফলতা প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে মানব-কণ্ঠোত্থিত হাহাকার-ধ্বনি অনেক কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ উমাচরণের অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া উমাচরণের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহ, 'হা বিধাতঃ!' বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। উমাচরণের

চরমকাল উপস্থিত হইবার যে আর বিলম্ব নাই তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। শরৎকুমারী, 'বাবাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুলোচনা কখন অপর কোন পুরুষের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন না। কিন্তু অদ্য আর তাঁহার সে সঙ্কোচ নাই। তাঁহার লোচন দিয়া অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে, কেশরাশি অবিন্যস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ—তিনি অদ্য পাগলিনী। সুলোচনা শয্যা-পার্শ্ব হইতে উঠিয়া সেই প্রতিবাসীর সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার পদ-নিম্নে পতিত হইয়া হস্তদ্বারা তাঁহার চরণ যুগল বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—

"ঠাকুর! আর কি উপায় নাই? এখন কি ঔষধ নাই? যদি কোন উপায় থাকে করুন। আমরা গরিব, আমাদের অর্থ নাই, কিন্তু চিরজীবন আমি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দাসী হইয়া থাকিব।"

বৃদ্ধ দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি সুলোচনাকে বলিলেন,—

"মা! উঠ। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। চেষ্টা কর, তাহার পর বিধাতার মনে যাহা আছে তাহার আর অন্যথা হইবার নহে। হা বিধাতঃ।"

সুলোচনা উঠিয়া অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া স্বামীর নিকটস্থ হইলেন। উমাচরণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহারা এ অবস্থা দেখিলে জানিতে পারিতেন যে, আর অতি অল্প কাল উমাচরণ এ জগতে থাকিবেন। উমাচরণ এখন অজ্ঞান নহেন। সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞান হইতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ক্লেশে সম্পাদিত হইতেছে। উমাচরণ এক এক বার বেশ কথা কহিতেছেন। তখনই হয়ত গ্রন্থিহীন, অর্থহীন কথা ব্যক্ত করিতেছেন, আবার সুলোচনাকে কাঁদিতে দেখিয়া উমাচরণ কিয়ৎকাল নির্ব্বাক ভাবে সুলোচনার বদনের প্রতি চাহিয়া

রহিলেন। ধীরে ধীরে কয়েক বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়ন বহিয়া পড়িল। তিনি কষ্টে বলিতে লাগিলেন,—

"সুলোচনে! বুঝিয়াছি এ যাত্রা আমি রক্ষা পাইব না। কিন্তু হৃদয়েশ্বরি! কাঁদ কেন? তোমার স্কন্ধে অনেক গুরু ভার পড়িতেছে। হা বিধাতঃ! বালিকা শরৎ—একটী ভাল বালকের সহিত উহার বিবাহ দিবে। আর কি বলিব? আমি কিছুই তোমাদের জন্য করিলাম না। বিধাতাই ভরসা, তাঁহারই চরণে তোমাদের রাখিয়া চলিলাম।"

উমাচরণ নীরব হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। সুলোচনার কি সাধ্য যে, তৎকাল অশ্রু সম্বরণ করেন? সুলোচনা পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"নাথ! প্রাণেশ্বর! শেষে অদৃষ্টে কি এই ছিল? ভগবান, তোমার মনে কি এতই ছিল? কোন্ পাপে আমার এ শাস্তি? হৃদয়েশ, তোমাকে ছাড়িয়া তোমার দাসী এক দিনও থাকিতে পারিবে না। আমার এত কি ভাবনা—তুমি চল, আমিও তোমার সঙ্গিনী হইব।"

উমাচরণ আবার বলিয়া উঠিলেন,—

"মা কোথায়?"

তখন শরৎকুমারী 'বাবাগো, বাবাগো' শব্দে চীৎকার করিতে করিতে উমাচরণের সম্মুখে আসিয়া বসিল এবং মুমূর্ষু পিতার বদনের উপর বদন রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—

"বাবা বাবা, আমাদের ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে বাবা? তোমাকে আর দেখিতে না পাইলে প্রাণ থাকিবে কেন বাবা? ওঃ বাবা, বুক যে ফাটিয়া যায় বাবা! তুমি যেখানে যাও আমাদের সঙ্গে লইয়া যাও বাবা! তোমার মত আমাদের আর যে কেউ নাই বাবা! আমাদের ফেলিয়া যাইও না বাবা, তোমার পায় পড়ি বাবা, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইও না বাবা। ওঃ মা, মাগো, মূর্চ্ছা যে গো! ও মা আমার কি হইল মা!"—

প্রতিবাসী প্রতিবাসিনী সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বাটীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। সেই বয়স্ক প্রতিবাসী আসিয়া রোরুদ্যমানা শরৎকুমারীকে ধরিয়া তুলিলেন এবং স্থানান্তরে লইয়া যাইবার প্রযত্ন করিতে লাগিলেন। শরৎ বলিতে লাগিল,—

"ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে আমার বাবার কাছে থেকে নিয়ে যেও না। আমি গেলে বাবা পলাইয়া যাইবেন। বাবা, বাবা, বাবাগো তোমার কাছে আমাকে থাকিতে দেয় না যে গো।"

শরৎকুমারীর আর্ত্তনাদে মনোযোগ না করিয়া দুঃখিনী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া প্রতিবাসী বাহিরে আসিলেন এবং তথায় জন কয়েক স্ত্রীলোকের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিলেন। উমাচরণের চক্ষু দিয়া দর বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ধীরে ধীরে সুলোচনার হস্তে স্বীয় হস্ত দিয়া বলিলেন,—

"সুলোচনে, মৃত্যু আর কিছুদিন যদি অপেক্ষা করিত তাহা হইলে ভাল হইত। আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। তুমি নিরাশ্রয় নিরবলম্বন হইলে। বালিকা কন্যা লইয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে, এ চিন্তা যখন আমার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, তখন আমার কি হইতেছে কি বলিব? হা দয়াময়, হা ভগবন্! শেষে আমার এই করিলে! আমার বক্ষের ধন শরৎকুমারী, যাহার চক্ষে এক বিন্দু জল দেখিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়, আমার প্রাণের প্রাণ সুলোচনা, যাহাকে এক তিল ভুলিতে পারি না, তাহারা সকলে আজি পড়িয়া থাকিল, কিন্তু আমি আর থাকিব না। এ জগতে তাহাদের আমিই ভরসা, সকল বিপদে তাহারা জানে আমিই তাহাদের রক্ষা করিব, অভাব বা অপ্রতুল, কষ্ট বা যাতনা সকল বিষয়েই যাহারা কেবল আমাকেই আশ্রয় বলিয়া জানে আজি তাহাদের ক্রন্দন, আর্ত্ত-

নাদ, অনুরোধ সমুদায়ই উপেক্ষা করিয়া আমি এমন স্থানে যাইতেছি যে স্থানে তাহাদের বিপদ বা সম্পদ, শোক বা সুখ কোন সংবাদই পৌঁছিবে না। কিন্তু কিছুতেই তো এ ব্যবস্থার অন্যথা হইবার নহে। জগদীশ্বর, তোমার মঙ্গলময় বাসনার অন্যথা করিতে কে পারে? যাহা তোমার বাসনা তাহাই হউক, কিন্তু প্রভো! এই প্রেমপুত্তলী অবলা আজি নিঃসহায় অবস্থায় সংসার-সমুদ্রে পড়িতেছে, ইহার কি হইবে দেব? ওঃ ভগবন, প্রাণ যে যায়! কিন্তু প্রাণেশ্বরী সুলোচনা আর সর্ব্বস্বধন শরৎ-কুমারীকে কোথায় ভাসাইয়া চলিলাম!"

উমাচরণ নীরব হইলেন, সুলোচনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"যিনি সকলের আশ্রয়, যিনি বিপন্নের ভরসা, তিনিই শরৎ-কুমারীকে রক্ষা করিবেন। তাহার জন্য ভাবনা কি? আর আমার কথা? যাহাকে তুমি কখন হৃদয় হইতে অন্তরিত করিতে পার না, যে তোমাকে সতত চক্ষের উপর রাখিতেই ভাল বাসে, তাহার সহিত কি কখন বিচ্ছেদ হয়? তোমার আমার মিলন, দিন, মাস, বৎসর বা যুগ দ্বারা নিরূপিত হইবার নহে। অনন্ত কালের নিমিত্ত, অনন্ত প্রেম দয়াময় পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়াছেন। তবে এত দুঃখ কি নাথ?"

উমাচরণ সেই প্রেমময়ী রমণীর বদনের প্রতি বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"সুলোচনে! তুমি জানিতেছ, শরতের শুভাশুভ অতঃপর তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে। আর আমি বলিতে পারি না; আর কিই বা বলিব? এ কর্ত্তব্য কখন বিস্মৃত হইও না।"

ক্রমশঃ উমাচরণের বাক্য কথনের ক্ষমতা তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—

দেব যুবতী রূপবতী ভার্য্যা অদ্য অনাথিনী। অন্ন, বস্ত্র, লজ্জা, মান, আশ্রয় কিছুই তাহার থাকিল না, সকলই তাহাকে স্বয়ং দেখিয়া লইতে হইবে। আর উমাচরণের কন্যা? সেই পিতৃহীনা বালিকার নবীন জীবন সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু যাহার যত্নে, যাহার সহায়তায়, সে জীবন সুখময় হইতে পারিত, সে অদ্য এমন স্থানে প্রস্থান করিল যে, ইহজীবনে তাহার সহায়তা দূরে থাকুক, হৃদয়ের হৃদয় ভেদ করিয়া কাঁদিলেও বারেক তাহার সাক্ষাৎ পাওয়াও যাইবে না!

প্রতিবাসিগণ মৃতের দেহ বস্ত্রাবৃত করিতে গেলেন। সুলোচনাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া তাহারা জানিতে পারিলেন, সুলোচনার জ্ঞান নাই, শরীর অবশ। তখনই সকলে মিলিয়া নানারূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। বহুযত্নে সুলোচনার চৈতন্য জন্মিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"কে ও—তোমরা আমাকে এখানে আনিলে কেন? আহা! আমি তাহার সহিত কেমন সুখে স্বর্গে বেড়াইতেছিলাম।"

তাহার পর সেই পতিগতপ্রাণা স্বাধ্বীর দৃষ্টি সেই বস্ত্রাবৃত শবের উপর পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ বেগে সেই দেহের উপর গিয়া পড়িলেন। আত্মীয় জনেরা তাহাকে ধরিয়া আনিতে গেল, দেখিল পূর্ব্বের ন্যায় আবার তাহার চৈতন্য তিরোহিত। এইরূপে কখন বা বাক্‌বিহীন সংজ্ঞাশূন্য অবস্থান, কখন বা উন্মাদিনীর ন্যায় বিকৃত জ্ঞান-যুক্ত অবস্থায় সুলোচনার বৈধব্যের প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হইল। আর সেই ধূলাবলুণ্ঠিতা বালিকা শরৎকুমারী? তাহার সেই করুণার্দ্র বাক্য, সে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, সে অবক্তব্য ক্লেশের কথা কে বলিতে পারে?

শরৎকুমারি! এ জগৎ সবে মাত্র তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হইতেছে। হৃদয়হীন, বিবেচনাহীন, নির্ম্মম সংসারের সমস্তই এখনও তোমার পুরোভাগে রহিয়াছে। অতএব বালিকে! অদ্যকার শোকে

অসহনীয় ব্যাপারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিও না। অবনি-মণ্ডল শোক, তাপ, কষ্ট ও যাতনার রঙ্গভূমি। তাই বলিতেছি, বালিকে! বুক বাঁধিয়া সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হও, অবসন্নতা দূর করিতে চেষ্টা কর এবং শোকের প্রস্রবণ দিয়া যে সকল পবিত্র ধারা নয়ন হইতে নিঃসৃত হইতেছে, তাহা এখনই নিঃশেষ করিও না। ইহারই নাম সুখের সংসার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দিবস সেই শোকপুরীতে কয়েকজন প্রতিবাসিনী শোকসন্তপ্তা সুলোচনার সান্ত্বনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন ও কয়েকজন প্রতিবাসী বিষণ্ণ বদনে অনাথিনীর ভাবী পরিণাম ও ইতিকর্ত্তব্যতা আলোচনা করিতেছেন।

সুলোচনার সেইরূপ অবস্থা। কখন বা চৈতন্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, কখন বা তিনি অজ্ঞান। অদ্য বঙ্গদেশের গৌরবান্বিত সামাজিক সুব্যবস্থার পরিচায়ক দিন। অদ্য একাদশী। স্বার্থপর, নীচাশয়, হৃদয়হীন বাঙ্গালী, স্ত্রী থাকিতে, তাহার বুকে বসিয়া আপনার ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য, ইচ্ছা হইলে, সাতটা বিবাহ করিবে—সমাজ সে কার্য্যের অনুমোদন করিবে, স্ত্রী বিয়োগ হইলে সামান্য শিষ্টাচার পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া, হয়ত এক মাসের মধ্যেই পুনরায় বিবাহ করিবে—সমাজ তাহারও পোষক। প্রেম কাহাকে বলে তাহা কি তাহারা জানে? স্বার্থ ত্যাগ প্রেমের ভিত্তি,কিন্তু সে তো দূরের কথা—পর-হৃদয়ের ভাব অনুভব করা অধম বাঙ্গালীর ক্ষমতার বহির্ভূত। যে যে অবস্থায় নিজের যে যে ক্লেশ হয়, সেই সেই অবস্থায় যে অপরেরও অবিকল তদ্রূপ ক্লেশ হইতে পারে, একথা এ ঘৃণিত জাতি বুঝে

অদ্য একাদশী। সুলোচনার জীবনে অদ্য প্রথম কঠোর একাদশী উপস্থিত। সুখের বিষয় অদ্য সুলোচনা এক প্রকার সংজ্ঞাহীনা। তাহার অধুনা যে অবস্থা তাহাতে ক্ষুৎপিপাসা বা দৈহিক কোন অভাব বা অসুখ স্থান পায় না। প্রতিবাসিনী কামিনীগণ সুলোচনার এই অজ্ঞান অবস্থা দেখিয়া নানারূপ কল্পনা করিতেছেন। একজন বলিলেন,--

"এই কাঁচা বয়স, তাহার উপর এই শোক। বাছা হয়ত সামলাইতে পারিবে না, মারাই বা যাইবে।"

আর একজন বলিলেন,—

"আহা, সে ত ভাগ্যের কথা। সুলোচনা যেরূপ সতী লক্ষ্মী, তাহাতে এ একাদশীর ভোগ হয়ত দেবতা উঁহাকে ভুগিতে দিবেন না।"

আর একজন বলিলেন,—

'না বাছা, যা হউক, কোলে এই মেয়েটা আছে। এটার একটা গতি দেখে মরতে পারিলেই ভাল হয়।'

আর একজন বলিলেন,—

'তোমার আমার কথায় তো কিছু হবে না। যা অদৃষ্টে আছে তা হবেই।'

এইরূপ সময়ে রামচরণ ডাক্তার সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন। উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিগত রাত্রেই পরলোক গত হইয়াছেন এবং এক্ষণে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমাপিত হইয়া গিয়াছে, একথা রামচরণ জানিতেন কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। ফলতঃ অধুনা তিনি অজ্ঞ ভাবেই উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসিলেন। দীননাথ প্রথমে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা, পরে কপালে করাঘাত করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত করিলেন। সমস্ত শুনিয়া রামচরণ একটুও বিস্মিত বা কাতর হইলেন না। কে বলিতে

পারে, রামচরণের ঔষধ ও চিকিৎসা এ মৃত্যুর কারণ কি না। যাহাই হউক, দীননাথ বলিলেন,—

'মহাশয় আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। সম্প্রতি উমাচরণের স্ত্রীর ভয়ানক পীড়া উপস্থিত। অত্যধিক শোকে এ পীড়া ঘটিয়াছে। যাহাই হউক, তাহার জন্য চিকিৎসার এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই। তবে আমরা বুঝি না, ইহাতে আশু মৃত্যু হয় কি না। সেইটা একবার মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলে ভাল হয়।'

ডাক্তার বলিলেন,—

'বটে, বটে? আহা! চলুন চলুন, এখনি দেখিতেছি।''

তাহার পর রামচরণ রোগীর নিকটস্থ হইলে অপরাপর স্ত্রীলোকগণ একটু সরিয়া তাহার জন্য স্থান করিয়া দিল। তিনি পীড়িতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন সেই নব-প্রেত রামচরণ একবার নয়ন ভরিয়া রোগীর সেই স্পন্দহীন দেহ দেখিল। রোগীর অবস্থা এবং যে বিজাতীয় মনস্তাপ হেতু তাহার বর্ত্তমান দশা উপস্থিত, সে সকল কথা রামচরণ ভুলিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, সুলোচনার অর্দ্ধমুকুলিত স্থির নেত্র, তাহার ললাটের রাগ-রঞ্জিত শিরা সকল, শায়িতাবস্থায় তাহার আয়ত বক্ষের অপূর্ব্ব গঠন, তাহার অযত্ন ন্যস্ত কেশরাশি, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সুপরিণত দেহ, এই সকল দেখিয়া কাহার সাধ্য হৃদয়কে স্থির রাখে? যাহার হৃদয়ে এই অসহ্য শোকের ভার, এবং যে স্বয়ং অধুনা শঙ্কটাপন্ন তাহাকে দেখিয়া মনুষ্য কোন রূপ দুশ্চিন্তা করিতে পারে, একথা কে জানিত? পিশাচ রামচরণ আবার ভাবিতে লাগিল, এই প্রতিবাসিনীগুলা সকল সময়ে এইখানেই মরে কেন? যাহাই হউক, আমরা অধুনা রামচরণের হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপ ব্যক্ত করিতে বাসনা করি না। রামচরণ পীড়িতার হস্ত ধারণ করিলেন। কেন? নাড়ী পরীক্ষা করিতে? কোথায় নাড়ী? কেবা তাহা দেখে? রামচরণ স্বীয় করে সুলোচনার মোহন ভুজবল্লী স্থাপন করিয়া

ভাবিতেছেন –'এ নশ্বর জগতে এতদপেক্ষা অধিকতর সুখ আর কি আছে?' ক্ষণেক পরে হস্ত ত্যাগ করিয়া রামচরণ পীড়িতার অধরোষ্ঠ একবার টিপিল, একবার তাহার গণ্ডদ্বয়ে হস্ত দিল। তাহার পর রামচরণ বদন আনত করিয়া পীড়িতার বক্ষের নিকট কর্ণ উপস্থিত করিল। তাহার গণ্ড সুলোচনার বক্ষ স্পর্শ করিল। তখন সে বেগে লাফাইয়া উঠিল, এবং উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন সে আর আপনাতে আপনি নাই। ভাবিল, 'যেরূপে হউক এই ভূলোক-দুর্লভ সুখ যদি আয়ত্ত না করিলাম, তবে বৃথাই এ জন্ম। যেমন করিয়া পারি, সুলোচনাকে আপনার করিব।' সে বাহিরে উপস্থিত হইলে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'কি বুঝিলেন, মহাশয়?'

রামচরণ কি উত্তর দিবে? সে রোগ কি তাহা জানে না। জানিতে তাহার ক্ষমতা নাই—সে সে চেষ্টাও করে নাই। তবে কি বলিবে? কিন্তু কিছু একটা বলা তো চাই। এই জন্য রামচরণ ডাক্তার কিছু থতমত খাইয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—

'দেখিলাম রোগ কঠিন বটে। মূর্চ্ছা রোগ; আরোগ্য হইয়া যাইবে। কিছু সময় লাগিবে। বিশেষ তদ্বির করা আবশ্যক। আমি আবার সন্ধ্যার সময় আসিব।'

দীননাথ বলিলেন, –

'সন্ধ্যার সময় আপনার কষ্ট করিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই। যদি আবশ্যক বুঝি, আমরা তৎক্ষণাৎ মহাশয়কে সংবাদ দিব।'

রামচরণ ডাক্তার অগত্যা সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সুলোচনার সেই অবস্থা। কখন কিঞ্চিৎ চেতন, আবার তখনি অচেতন। আর শরৎকুমারী? সে পিতৃহীনা বালিকা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া অধোবদনে পড়িয়া রহিয়াছে। এক প্রতিবাসিনী কামিনী তাহাকে কত সান্ত্বনার কথা বলিতেছে। সে সেই সকল কথায় হয়ত আরও কাঁদিয়া উঠিতেছে। অহো! বালিকার হৃদয়ে কি ক্লেশ!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আরও পাঁচ দিন অতীত হইল—সুলোচনার ব্যাধির কোন শান্তি হইল না। সময়ে সময়ে একটু একটু দুধ কোন প্রতিবাসিনী জোর করিয়া তাঁহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিত, কষ্টে ও অজ্ঞাতসারে তিনি তাহা উদরস্থ করিতেন মাত্র। কখন কখন তিনি কথা কহিতেন, কিন্তু সে সকল কথা অসম্বদ্ধ, লোকে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিত না। কিয়ৎকাল মাত্র কথা কহিয়া আবার তিনি নীরব হইতেন, আবার তাঁহার নেত্র মুদিত হইয়া আসিত এবং দেহ কঠিন হইয়া পড়িত। এইরূপে তাঁহার বৈধব্যের পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীগণের ক্রমশঃ যাতায়াত কমিয়া যাইতে লাগিল। দীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রত্যহ স্বয়ং দুইবার করিয়া আসিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী দুই বেলা চারিটী করিয়া ভাত আনিয়া শরৎকুমারীকে খাওয়াইয়া যাইতেন। অন্যান্য প্রতিবাসিনীগণও এক এক বার আসিতেন।

সুলোচনার এই অবস্থা দেখিয়া পল্লীবাসিনী কামিনীগণ নিতান্ত চিন্তিতা ছিলেন, বিশেষতঃ কন্যাটীর জন্য সকলে আরও ব্যাকুল হইলেন। শরৎকুমারীর একে এই নিদারুণ কষ্ট, তাহার উপর মাতার এই অবস্থা। তাহার চিন্তা, ব্যাকুলতা ও ক্লেশের আর সীমা নাই। কেবল দিন রাত্রি বালিকা ক্রন্দনেই অতিবাহিত করে। যে যখন আইসে বালিকা তখনই তাহার পায় হাত দিয়া আমার মাতাকে ভাল করিয়া দেও বলিয়া অনুরোধ করে। এইরূপ অত্যধিক মানসিক ক্লেশ, উৎকণ্ঠা ও অত্যাচার হেতু শরৎকুমারীর জ্বর হইয়া পড়িল। আত্মীয়গণ বালিকার জ্বর দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন।

কিন্তু শরতের স্বরে আজ সুলোচনার কিঞ্চিৎ পরিমাণে চৈতন্যের লক্ষণ দেখা গেল। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার যেরূপ চৈতন্য হয়, সেইরূপ হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে শরৎকুমারীর পীড়ার কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল। যদিও একথা বুঝিতে না বুঝিতে তাঁহার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া গেল, তথাপি যখন পুনরায় তাঁহার চৈতন্যের আবির্ভাব হইল, তখন তিনি প্রথমেই বলিলেন,—

'শরৎ—শরৎ! আমার শরৎ কোথায়?'

সেই সময়ে শরৎকুমারী 'মা মা' বলিয়া জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিল; কিন্তু তখনই পুনরায় সুলোচনার চৈতন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল। এবার অচৈতন্য ভাবটা অধিকক্ষণ থাকিল না। অবিলম্বে আবার চৈতন্য হইল। তিনি বারম্বার কন্যার বদন চুম্বন করিলেন। তখন কন্যার অবস্থা, আত্মাবস্থা, বাহ্য জগতের সত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান হইল। যাহাতে এক্ষণে তাঁহার সংসারের একমাত্র আনন্দবর্দ্ধিকা, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থল, আশার একমাত্র যষ্টি শরৎকুমারী স্বচ্ছন্দ ও নির্বিঘ্ন হয় এই চিন্তাই বলবতী হইয়া উঠিল।

এ সংসারে স্নেহ অসাধ্য সাধনে সক্ষম। সকল ক্লেশ, সকল যাতনা, সকল মনস্তাপ স্নেহ ভুলাইয়া দেয়। স্নেহ মানুষকে দুষ্কর কার্য্যও সহজ-সাধ্য বলিয়া প্রতীত করায়, সংসারের যাবতীয় শিথিল বন্ধন দৃঢ় করিয়া দেয় এবং যে জীবন ভারভূত ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহাও স্নেহভাজনের কল্যাণ-কামনায় রক্ষা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ জন্মে। স্নেহের পবিত্র বন্ধন শূন্য হইয়া গেলে মানব একদিনও সংসারে থাকিতে পারে না। ধনোপার্জ্জন, যশোপার্জ্জন, বিষয়-লালসা প্রভৃতি কার্য্য সমস্তের স্নেহই প্রধান প্রণোদক। আজি স্নেহের মধুর সম্বোধনে সুলোচনার বিগত চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব হইল এবং তাঁহার কোন অনিষ্ট হইলে শরৎকুমারীর কি হইবে, এই ভাবনায় তাঁহাকে

ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শরৎকুমারীর বিবাহ হইলে তাহার ইষ্ট চিন্তার নিমিত্ত অনেক আত্মীয় হইবে। অতএব যতদিন শরৎ-কুমারীর বিবাহ না হয়, ততদিন তাহার ইষ্টানিষ্টের জন্য তিনিই দায়ী। এই ভাবিয়া সুলোচনা আপনার ব্যথিত হৃদয়কে সাংসারিক চিন্তায় নিযুক্ত হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন শরৎকুমারীর যথাবিধ চিকিৎসাদির উপায় চিন্তায় সুলো-চনা ব্যস্ত হইলেন। ব্যস্ত হইলেন বটে—মনকে সকল ব্যথা ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন বটে, তথাপি তাহার যে যাতনা তাহাতো একবারও ভুলিবার নহে। তাঁহার অচৈতন্য ভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল বটে কিন্তু একবারে গেল না। তত ঘন ঘন চেতনাশূন্য না হইয়া তিনি এখন সময়ে সময়ে অচেতন হইতে লাগিলেন। অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য অনেক কমিয়া গেল, কিন্তু একেবারে গেল না।

সুলোচনা স্বয়ং বন্ধনাদি করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারীর ব্যাধি ঈশ্বরেচ্ছায় চারি পাঁচ দিনের মধ্যে আপনিই সারিয়া গেল। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিলে, অন্যমনস্ক দেখিলে শরৎ বড়ই বিমনা হইত এবং কাঁদিয়া আকুল করিত। তখন তাহার পিতার শোক বড়ই বাড়িয়া উঠিত এবং সে পিতাকে স্মরণ করিয়া মাটীতে পড়িয়া আছড়া বিছড়ি করিয়া কাঁদিত। শরৎকে অন্যমনস্ক রাখিবার নিমিত্ত সুলোচনা নয়নের অশ্রুজল নয়নেই মিশাইতেন এবং হৃদয়স্থ প্রবল শোকানল হৃদয়েই প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। এইরূপ কষ্টে সুলোচনা ও শরৎকুমারীর দিন কাটিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে তিনি মাস কাটিয়া গেল। তিন মাস গেল বটে, কিন্তু সুলোচনার পক্ষে যেন তিন দিনও অতীত হইল না। তাহার যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তিনি তাহা প্রতিনিয়ত চক্ষের সমক্ষেই দর্শন করিতেছেন, কোথা দিয়া দিবারাত্রি চলিয়া যাইতেছে, কোথা দিয়া চন্দ্র সূর্য্য চলিয়া যাইতেছে, তিনি তাহা একবারও ভাবিতেছেন না। সুতরাং তিন মাস কাল তাঁহার পক্ষে তিন দিনও বোধ হইল না। তাহার চিত্ত একই চিন্তায় নিবিষ্ট, একই বিষয় অনু-ধ্যানে তিনি রত এবং একই প্রসঙ্গ তাঁহার আলোচ্য।

চিন্তা ও কালের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। আমরা তাহা লক্ষ্য করি বা না করি, চিন্তা ও কাল উভয়ে অবচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। দার্শনিক-প্রবর স্যর উইলিয়ম হ্যামিল্টন (Sir William Hamilton) * এবং হার্বার্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer) † চিন্তা ও কালের সম্বন্ধ বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এতদুভয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট ও অবিচ্ছেদ্য—একের সহিত অপর দৃঢ় সূত্রে গ্রথিত। পণ্ডিতবর লক (Locke) ‡ বলিয়াছেন, আমাদের মনে যুগপৎ যে সকল ভাব আবির্ভূত হয় তাহার আলোচনা দ্বারাই কালের উপলব্ধি হয়, এবং এই কারণেই যদি আমরা প্রশান্ত অর্থাৎ স্বপ্নাদি বিহীন ভাবে নিদ্রিত হই, তাহা হইলে নিদ্রাকালের বা

* Lectures on Metaphysics Vol II

† First Principles

‡ Essay on Human Understanding

তাহার দীর্ঘভাব কোন উপলব্ধি করিতে পারি না, এবং যে সময় হইতে আমরা চিন্তার হস্ত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিদ্রিত ও নিদ্রাভঙ্গ সহকারে যে সময় আমরা পুনরায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, এতদুভয়ের দূরত্ব-বিষয়ক কোনই বোধ জন্মে না।' তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে একই চিন্তায় বিনিবিষ্ট থাকে, এবং তাহার তথাবিধ চিন্তা কালে মনে অন্য যে সকল ভাব-প্রবাহ উপস্থিত হয় তাহার প্রতি কোনই লক্ষ্য করে না, তাহার একাগ্র চিন্তাধিকৃত কালের বহুলাংশ তাহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করে, এবং সেই কাল তাহার বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া প্রতীত হয়।' এ সম্বন্ধে অন্য কিছু আলোচনা করিবার এ স্থল নহে।

যাহা হউক সুদীর্ঘকালও সুলোচনার একই বিষয়াবিষ্ট চিত্তের নিকট অত্যল্প বলিয়া অনুমিত হইল। কাল চিত্তের শান্তি সংস্থাপন পক্ষে মহৌষধ। চিত্ত যে পরিমাণে আকুল হয়, পুনরায় শান্তি বিধানার্থ সেই পরিমাণে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। সুলোচনার চিত্তের যে আকুলতা তাহা অপরিমেয়। সুতরাং তথায় প্রকৃত শান্তি সংস্থাপন কার্য্য কালের সাধ্যায়ত্ত নহে। সে ছিন্ন ভিন্ন দলিতকারী শোক, সে অবক্তব্য, অসহ্য, দুর্দ্দমনীয় কাতরতা, সে তীব্র তুষানল—কাল তাহার নিকট পরাজিত। সে যন্ত্রণার একই ঔষধ, সে ঔষধ মৃত্যু। সুলোচনা মৃত্যুর সুশীতল ক্রোড়ে শান্তি পাইবেন বলিয়া আশা করিয়া আছেন কিন্তু মৃত্যুর মহা ব্যাঘাত রহিয়াছে। সে ব্যাঘাত শরৎকুমারী। এ ভীষণ সংসার-সমুদ্রে বালিকা, সহায় সম্পত্তি বিহীনা শরৎকুমারী কি উপায় অবলম্বন করিবে, এই ঘোর জীবন-যুদ্ধে জ্ঞানহীনা বালিকা কাহার আশ্রয় লইবে, ইহা যখন সুলোচনা চিন্তা করিতেন তখনই তাঁহার মৃত্যু-সংকল্প হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে হইত। তখনই ভাবিতেন, যতদিন পিতৃহীনা বালিকার একটা

হাট হইতে কাপড়ের কার্য্য পাইবার সুবিধা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রত্যুত সেই দিনই করুণহৃদয় চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং বাজার-হাট গিয়া একজন পরিচিত তন্তুবায়ের সহিত এতদ্বিষয়ক পরামর্শ স্থির করিয়া আসিলেন। স্থির হইল, তন্তুবায় রূপনগর-বাসী একজন পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা কাপড় পাঠাইয়া দিবে এবং আনাইয়া লইবে এবং তাহারই দ্বারা নিয়ম মত পয়সা পাঠাইয়া দিবে। পরদিন হইতে পরামর্শ মত কার্য্য চলিতে লাগিল। রূপনগরের রাধানাথ পাল নামক এক তেলি বাজারহাটের তন্তুবায়ের নিকট হইতে কাপড় আনিয়া সুলোচনার হস্তে দিয়া গেল এবং যথাসময়ে পয়সা আনিয়া দিবে ও কাপড় লইয়া যাইবে, বলিয়া গেল।

শরৎকুমারী বস্ত্র দেখিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, –

'এ কাপড় কি হবে মা?'

অশ্রু-ভারাবনত-নয়না সুলোচনা বলিলেন, –

'ইহাতে ফুল তুলিতে হইবে?'

'কেন মা?'

অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সুলোচনা বলিলেন, –

'তাহা হইলে পয়সা দিবে।'

শরৎকুমারী পুনরায় জিজ্ঞাসিল, –

'পরের কাপড়ে ফুল তুলিয়া পরের কাছ থেকে পয়সা লইবে মা? পরের পয়সায় কাজ কি মা?'

তখন সুলোচনার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, –

'আমাদের কে আছে, বাছা?'

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল এবং তিনি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যুষে সুলোচনা গৃহকর্ম্মাদি শেষ করিয়া কাপড় লইয়া ফুল বুনিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে শরৎ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটস্থ হইল এবং কাপড়ের অপরাংশ লইয়া ফুল বুনিতে আরম্ভ করিল।

অদ্য উমাচরণের জীবন-সর্ব্বস্ব সুলোচনা ও শরৎকুমারীর এই দশা। তাঁহাদের দশার সহিত ভিখারিণীর অবস্থার বিশেষ প্রভেদ নাই, অদ্য তাঁহারা পর-মুখ-প্রত্যাশিনী। তাঁহাদিগকে ভাল কথা বলিবে, তাঁহাদের বিপদের অংশ গ্রহণ করিবে, তাঁহাদের বাসনা লক্ষ্য করিবে, এ জগতে এমন কেহ নাই। অদ্য তাঁহারা অনাথিনী, নিরাশ্রয়া, ভীতা ও মর্ম্মাহতা। কবি বলিয়াছেন,—

'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।'

কিন্তু এ অধঃপতিত চক্রনেমি আর কি কখন ঊর্দ্ধে উঠিবে? এ দগ্ধ জীবন আর কি কখন সজীব হইবে? এ মরুভূমে কখন কি সুশ্যামল তৃণক্ষেত্র দেখা দিবে? এ বিপদ ঝঞ্ঝা কখন কি বিদূরিত হইবে? এ জগতে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে কাহার ক্ষমতা আছে? যে দুর্লক্ষ্য সূত্রদ্বারা এই বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে, যে অমোঘ নিয়মের বশীভূত হইয়া মানব জন্ম, মৃত্যু ও জরার অধীন হইতেছে সেই সূত্রের সূত্রধর ও সেই নিয়মের নিয়ন্তার মনে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অভ্রভেদী হিমাদ্রি পর্য্যন্ত এবং চক্ষুরগোচর কীটাণু হইতে অতিকায় করিরাজ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ-বিষয়ক ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে। অতএব সুলো-

চনা ও শরৎকুমারীর পরিণাম কি হইবে তাহার উত্তর তিনি ভিন্ন আর কে দিবে?

শরৎকুমারী একটী ফুল শেষ করিয়া বলিলেন,—

'দেখ দেখি মা, ফুলটী কেমন হইল?'

সুলোচনা প্রথমে ফুল দেখিলেন, পরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শরতের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—

'আমার ফুলের চেয়েও তোমার ফুল ভাল হইয়াছে।'

ফলতঃ এ কয়দিনে শরৎকুমারী সূচীকর্ম্মে বিলক্ষণ নিপুণা হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথমতঃ শরৎ জননীকে এতাদৃশ কার্য্যে নিযুক্তা দেখিয়া এবং ক্রমশঃ কেন এ কাজ করিতে হইতেছে তাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারা যায়, তৎপক্ষে যত্নবতী হইলেন এবং প্রথম দিন মাতাকে ফুল কাটিতে দেখিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র ছিন্ন বস্ত্রে ফুল কাটিতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারিটী ফুলের পর তাহার কৃত ফুল সকল এমন ভাল হইতে লাগিল যে, তাহাকে নূতন বস্ত্রে ফুল বুনিতে নিষেধ করিবার কোনই কারণ থাকিল না। এইরূপে মা ও মেয়ে এই কার্য্যদ্বারা সময়পাত ও জীবিকাপাতের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক, তাহাদের উভয়ের চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে ক্ষণে ক্ষণে আপনাদের অপরিমেয় শোক ও বিপদের চিন্তা হইতে বিরত হইত লাগিল।

শরৎকুমারী জিজ্ঞাসিল,—

'মা, কালি যে কাপড়ে ফুল তুলিয়া রাধানাথকে দিলে তাহার পয়সা পাইয়াছ?

সুলোচনা বলিলেন,—

'না মা, সে পয়সা এখনও পাই নাই। রাধানাথ এখনি আসিবে কথা আছে। আসিলে পয়সা দিয়া যাইবে, আবার কাপড় দিয়া যাইবে, আর এ কাপড়ও লইয়া যাইবে।'

শরৎকুমারী বলিলেন,—

'তবে মা, শীঘ্র বাকী ফুল কটা সারিয়া ফেল।'

মা ও মেয়ে আবার একমনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে শরৎকুমারী আবার জিজ্ঞাসিল,—

'মা, আগেকার কাপড়ের জন্ত তোমাকে কটা পয়সা দিবে মা?'

সুলোচনা বলিলেন,—

'তাহা তো জানি না মা, শুনিয়াছি সে কাপড়ে যেরূপ কাজ ছিল, তাহাতে আট আনা দেওয়া উচিত। কত দিবে তাহা তাহারাই জানে, আমাদের অদৃষ্ট।'

শরৎকুমারী বলিলেন,—

'আট আনাই দেবে। আট আনায় আমাদের অনেক উপকার হবে, নয় মা?'

এইরূপ সময়ে বাহিরে কাশীর শব্দ করিয়া দরজা ঠেলিয়া রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল,—

'মা ঠাকুরাণি, কোথা গো।'

তাহাকে দেখিবামাত্র শরৎ বলিল,—

'এই যে মা, রাধানাথ দাদা আসিয়াছে।'

সুলোচনা শরৎকুমারীর দ্বারায় রাধানাথকে বসিতে বলিলেন। রাধানাথ লোকটা দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে। দোষের মধ্যে রাধানাথ কিছু লোভী এবং প্রবঞ্চক। অন্যান্য বিষয়ে রাধানাথের চরিত্র নিতান্ত মন্দ নহে। রাধানাথ সুলোচনাকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিল এবং টেঁক হইতে আটটী পয়সা বাহির করিয়া শরৎকুমারীকে বলিল,—

'দিদি! এই পয়সা কয়টা তোমার মাকে দেও।'

শরৎ পয়সা কয়টী জননীকে দিল। সুলোচনা পয়সা কয়টী গণিয়া লইতে লজ্জিত হইলেন সুতরাং হাতে করিয়া লইয়া আবার রাখিয়া দিলেন। বুঝিলেন, পয়সার সংখ্যা তাহার আশার অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু কি করিবেন-বলিলেন,—

"বাবা, তুমি চিরজীবী হও। আমাদের তুমি যে উপকার করি তেছ, এমন আর কেহ করে না। আমরা যার পর নাই গরিব।"

রাধানাথ বলিল,—

আমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না মা, আমি আপনার সন্তান জানিবেন। এবার নাকি আপনার প্রথম কাজ তাতেই তত ভাল ওতরায় নাই। পয়সা কিছু কম হয়েছে। ক্রমে বেশী হইবে। যাহাতে দু পয়সা বেশী আইসে আমি তাহার তদ্বির করিব। সে তাতীর হাত হইতে দুটা পয়সা ব্রাহ্মণের হাতে আনিয়া দিতে পারিলে লোকত ধর্ম্মত উভয়ত লাভ। এ কাপড়খানা শেষ হইয়াছে কি মা?"

সুলোচনা বলিলেন,—

'হইয়াছে।'

তাহার পর সুলোচনা কাপড় ভাজ করিয়া রাধানাথের নিকট দিলেন। রাধানাথ বগল হইতে একটী ক্ষুদ্রকায় মোট বাহির করিল। তাহাতে ২ খানি মাত্র নূতন কাপড় ছিল। সে কাপড় দুখানি সুলোচনাকে দিয়া রাধানাথ প্রাপ্ত বস্ত্রখানি গ্রহণ করিল এবং বলিল,—

'আজিকার কাপড় বড় ভাল। এ কাপড় কি কাহাকে দেয়, আমি অনেক বলিয়া কহিয়া আনিয়াছি। ইহাতে বড় সূক্ষ্ম কাজ চাই। বেটা তাতী বলে, এ কাজ আপনাদের নয়। আমি বলি, আমার মাঠাকুরাণী পারেন না এমন কর্ম্মই নাই। যাহা হউক, যাহাতে আমার মুখ রক্ষা হয় তাহা করিবেন। পয়সা কিছু বেশী দিতেই হবে — কাজ তো সোজা নয়। এখন তবে আসি মা ঠাকুরাণী।'

সুলোচনা বলিলেন,—

'এস, তুমিই আমাদের সহায়। তোমাকে আর কি বলিব?'

রাধানাথ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

শরৎ জিজ্ঞাসিল,—

'মা রাধানাথ কত পয়সা দিল মা?'

শুনে চন্দ্রা গণনা করিয়া বলিলেন,—

'আটটী।'

শরৎকুমারী জননীর গলা জড়াইয়া সাশ্রুনয়নে বলিল,—

'মা, তুমি দুই দিন অনবরত পরিশ্রম করিলে, তার মজুরি কি কি মোটে আটটী পয়সা মা?'

সুলোচনা অঞ্চলে কন্যার নয়ন মার্জ্জন করিয়া বলিলেন,—

'কি করিব মা, আমার অদৃষ্ট।'

নবম পরিচ্ছেদ।

কায়ক্লেশে জীবন-যাত্রা চলিতে লাগিল। এক দিন অন্তর আটটী, দশটী কদাচ বা বারটী পয়সা রাধানাথ আনিয়া দিত। প্রতি দিন হিসাব মত পাঁচ ছয়টীর অধিক পয়সা আয় হইত না। প্রকৃত পক্ষে সুলোচনা ও শরৎকুমারীর সমস্ত দিন শ্রমের পুরস্কার এত অল্প নহে। তাহারা যে কার্য্য করিতেন তাহাতে একদিন অন্তর তাঁহাদের অন্ততঃ চারি বা ছয় আনা পাওয়া উচিত। কিন্তু মানবচরিত্র বুঝা ভার। দেবচরিত্র প্রণিধান করা সম্ভব, তথাপি মানব-প্রকৃতি প্রণিধান করা সহজ নহে। ক্ষুদ্রহৃদয় রাধানাথ প্রতিদিনই অনাথিনী স্ত্রীলোকের বহু যত্নার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিত। অগত্যা সুলোচনা দিনান্তে পাঁচ ছয় পয়সার অধিক পাইতেন না। কিন্তু যাহা পাইতেন, ধরিতে গেলে রাধানাথ মধ্যে না থাকিলে তাহাও পাইতে পারিতেন না। সুতরাং রাধানাথ যাহা করে তাহা জানিলেও সুলোচনার সতর্ক হইবার উপায়ান্তর ছিল না। বরং পাছে, রাধানাথ অসন্তুষ্ট হয়, পাছে সে যতটুকু দয়া করিতেছে তাহাও না করে, এই ভয়ে নিয়ত সশঙ্কিত থাকিতে হইত।

যাহা হউক, বহুযত্নে, সুলোচনা ও শরৎকুমারীর অবিরত শ্রমে দিনান্তে এই সামান্য মাত্র আয় হইত। যে আয় হইত তাহাতে দুই জনের আহার চলা অসম্ভব। সুলোচনা অন্নাদি প্রস্তুত করিতেন, শরৎ তখন কাপড়ের কাজ করিত। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে সুলোচনা অগ্রে শরৎকে আহার করাইতেন। শরৎ আহার করিতে করিতে যদি প্রয়োজন হইত, তথাপি সাহস করিয়া আর চারিটী ভাত চাহিতে পারিত না। ভয়, পাছে মায়ের কম হইয়া যায়, মা কিন্তু জিদ্ করিয়া কন্যাকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইতেন এবং নিজের জন্য এখনও যথেষ্ট অন্নাদি আছে বলিয়া তাহাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিতেন। শরৎকুমারী আহার সমাপ্ত করিয়া পুনরায় কাপড় লইয়া বসিতেন। সুলোচনা সেই সময়ে কোন দিন মুষ্টি-পরিমিত অন্ন, কোন দিন শাক, কোন দিন উপবাস, কোন দিন—অহো! সে বিষাদ-কাহিনী বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম! বঙ্গের বিধবা—দিনান্তে একবার মাত্র আহারের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু যাহার আহার জুটে না সে জলযোগ করিবে কোথা হইতে? এই ত নিত্য ব্যবস্থা, তাহার উপর একাদশীর যন্ত্রণা। মনস্তাপে, দৈহিক শ্রমে, অনাহারে, অনাথিনী সুলোচনা যার পর নাই ক্ষীণ ও কাতর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে কন্যা তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারে, তাঁহার দেহের অবস্থা বুঝিতে পারে, তাঁহার আহারের বৃত্তান্ত অনুমান করিতে পারে এবং পাছে তাঁহাকে কাতর বা চিন্তিত দেখিলে তাহার শোকাবেগ প্রবল হয়, এই ভাবনায় স্নেহপরায়ণা সুলোচনা হৃদয়ের ভাব সতত যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

শরৎকুমারী—পিতৃহীনা বালিকা, মাতার সাহায্যার্থে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিত। জননী বারম্বার নিষেধ করিলেও বালিকা কার্য্য হইতে বিরত হইত না। এইরূপ নিরন্তর পরিশ্রম এবং যথোপযুক্ত আহারের অভাব প্রযুক্ত বালিকার স্বভাবতঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ অচিরে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তাহার পর হঠাৎ একদিন

বিষম জ্বর হইল। শোকসন্তপ্তা সুলোচনার সংসারের একমাত্র অবলম্বন শরৎকুমারীর কঠিন পীড়া। সুলোচনা ভয়ে ও ভাবনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। যে সামান্য কার্য্য দ্বারা কথঞ্চিৎ উপায়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছিল তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। রামচরণ ডাক্তারের দ্বারায় শরৎকুমারীর চিকিৎসা করা হইবে না, ইহা সুলোচনার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল, অগত্যা দীননাথ চট্টোপাধ্যায় বাজারহাট হইতে একজন বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন। বৈদ্য বলিলেন,—

'একচল্লিশ দিন রোগের মিয়াদ, একচল্লিশ দিন কাটিয়া গেলে রোগী সারিতে পারেন।"

প্রতিদিন দুইবার করিয়া বৈদ্য আসিতে লাগিলেন। বৈদ্যের দর্শনী, ঔষধের ব্যয়, রোগীর পথ্যাদিতে অনেক খরচ হইতে লাগিল। সম্বলের মধ্যে শরৎকুমারীর কয়খানি সামান্য অলঙ্কার। কিন্তু শরৎ-কুমারীর জীবনের তুলনায় তাহার কোনই মূল্য নাই। ক্রমে ক্রমে শরতের যে কিছু সামান্য ভূষণ ছিল তাহাও বিক্রীত হইয়া গেল।

শরৎকুমারী অজ্ঞান। সুলোচনা নিরন্তর পীড়িতার পার্শ্বে বসিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন এবং 'যখন তেমন তেমন বুঝিব তখন আত্মহত্যা দ্বারা সকল যন্ত্রণার শান্তি করিব' বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন।

ঘরে ঘটী বাটী সিন্দুক প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তাহাও গেল। তাহার পর ঘরখানি ও জমিটুকু বন্ধক দিয়া টাকা ধার লওয়া হইল। সুতরাং অর্থাভাবে শরতের চিকিৎসার কোনই ব্যাঘাত ঘটিল না। ইহার পর যে কি হইবে, তাহা ভাবিবার এখন সময় নহে, তাহা একবার মনেও হইল না। শরৎ ভাল হইলে হয়, ইহাই সুলোচনার একমাত্র চিন্তা। ঘরে ভাত খাইবার একখানি থালা, জল খাইবার একটী ঘটী, অধিক কি মাথা দিবার আশ্রয় স্থান টুকুও থাকিল না।

যে বিধাতা তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাদ্রি রচনা করিয়াছেন, অতলস্পর্শী সমুদ্রও তাঁহারই রচনা। যে বিধাতা ধনজন-পরিবৃত অট্টালিকা-বাসী ধনীর সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্নবস্ত্র-বিহীন, দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িত ব্যক্তিও তাঁহারই সৃষ্ট। তাঁহার বাসনার মর্ম্মোদ্ভেদ করা ক্ষুদ্র মানবের, ক্ষুদ্র ধর্ম্মোপদেষ্টার, ক্ষুদ্র তার্কিকের সাধ্য নহে। ভাগ্যের গতি কখন কোন্ দিকে আবর্ত্তিত হয় এবং কাল-চক্র মানবের অদৃষ্টকে কখন কিরূপে উন্নত ও অবনত করে তাহা কে বলিতে পারে?

দশম পরিচ্ছেদ।

যাশ্মে ধাশ্মে একচল্লিশ দিন কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার পর? সংস্থান যেখানে যাহা ছিল সবই গেল, এখন এ দুইটা প্রাণী খায় কি? বাচে কিসে? অতি যত্নে, অতি ক্লেশে শরৎ বাঁচিবার মত হইল বটে কিন্তু এখন পথ্যাভাবে মারা যায় যে! ভিক্ষা ভিন্ন আর কোন উপায় নাইতো! ভিক্ষা কি ভয়ানক কথা! সুলোচনা ভিক্ষা করিবেন। না, না—প্রাণ থাকিতে সুলোচনা পরের নিকট অভাব জানাইতে বা কাহার করুণা উৎপাদন করিতে পারিবেন না। তবে উপায় কি? যেদিন শরৎ প্রথম পথ্য করিল, সেদিন করুণহৃদয় দীননাথ নিজ ভবন হইতে চারিটি ভাত দিয়া গেলেন। অর্দ্ধাশন বা উপবাসই সুলোচনার অবলম্বন, তাঁহার সেইরূপই চলিতে লাগিল। দীননাথ দরিদ্র নিত্য অন্ন দ্বারা সাহায্য করা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। ক্ষমতা থাকিলেও সুলোচনা তাহা কদাচ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন না। কষ্টের আর অবধি নাই।

সুলোচনার দিন যায় না—প্রাণের শরৎকুমারী বাঁচে না। অগত্যা সুলোচনা প্রতিবাসিগণের নিকট আপনার অবস্থা না জানাইয়া থাকিতে পারিলেন না। কোন প্রতিবাসী একটু মিছরি, কেহ বা চারিটী সাগু, কেহ বা দুইটা পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাই বা তাহারা কয়দিন দিবে? প্রতিবাসীর মধ্যে কেহ কেহ বিরক্ত হইতে লাগিল, কেহ কেহ অক্ষমতা হেতু কোন প্রকার সাহায্য করা বন্ধ করিল, কেহ কেহ কেবল সহানুভূতি মাত্র প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইল।

সুলোচনা কন্যার মস্তক সমীপে বসিয়া তাহার রুক্ষ কেশ-রাশি সুবিন্যস্ত করিতেছেন এবং তাহার রোগ-জীর্ণ, কাতর বদনের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন আর আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। নয়নকোণে এক বিন্দু জল দেখা দিতেছে, তখনই সাবধানতা সহকারে সে বিষাদ চিহ্ন বিদূরিত করিতেছেন। কি হইবে? কেমন করিয়া দিন যাইবে? এ চিন্তার অবসান নাই। কাপড়ের কাজ করিয়া যে দুই চারিটা পয়সা পাইতেন তাহাও এখন বন্ধ। শরৎ স্বচ্ছন্দ না হইলে কোন কাজই হয় না। আর তো উপায় নাই। তবে কি সুলোচনার জীবন সর্ব্বস্ব শরৎকুমারী এক্ষণে আহার অভাবে মারা পড়িবে?

বাহিরের দ্বারে খিল আঁটা ছিল না—চাপা ছিল। ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। খুট্ খুট্ করিয়া জুতার শব্দ হইতে লাগিল। সুলোচনা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, রামচরণ ডাক্তার। ভয়ে, বিরক্তিতে, ঘৃণায় সুলোচার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি যথাসাধ্য যত্নে হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন: রামচরণ ভাবিলেন, "প্রথম প্রথম এরূপই হয়—ক্রমে দেখা যাবে।" বলিলেন,—

"ভাল আছ তো?"

সুলোচনা উত্তর দিলেন,—

"হুঁ।"

আবার রামচরণ জিজ্ঞাসিলেন,—

"শরতের বড় ব্যারাম হইয়াছিল, এখন ভাল আছে তো?"

আবার উত্তর হইল,—

"হাঁ।"

রাম। এত, ব্যারাম, এত কষ্ট—আমাকে একটা কথা জানাইতে নাই?

সুলো। দরকার হয় নাই।

রামচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"সুলোচনা, আমাকে পর ভাবিও না। আমার দ্বারা তোমার অনেক উপকার হইতে পারে। আমি মনে মনে কেবল তোমাদের কথাই ভাবি। কি করিলে তোমাদের উপকার হয় বল, আমি এখনই করিতেছি।"

সুলোচনা বলিলেন,—

"আমি অনাথিনী, নিঃসহায়া। ভিক্ষা ও পরানুগ্রহে আমি দিন যাপন করি। আপনি দয়া করিয়া আমার বাটীতে না আসিলে আমার বিশেষ উপকার হয়।"

রামচরণ বলিলেন,—

"সে কি কথা! তুমি ভিক্ষা করিবে? তোমার করুণা কত লোক ভিক্ষা করে—তোমার কিসের অভাব? এই লও টাকা—তুমি আমাকে পর ভাবিও না—তোমার কোন অভাব থাকিবে না।"

এই বলিয়া রামচরণ ডাক্তার পকেট হইতে চারিটী টাকা বাহির করিয়া সুলোচনাকে দিতে গেলেন।

সুলোচনা বলিলেন,—

"আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রয়োজন নাই। একণে দয়া করিয়া আপনি এস্থান হইতে বিদায় হউন। আপনার

ন্যায় ব্যক্তি এস্থানে আসিলে আমার মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা। লোকের শ্রদ্ধাই আমার জীবন।"

রামচরণ হাসিয়া বলিলেন,—

"লোক—এ রূপনগরে লোকটা কে? কোন্ ব্যাটা রামচরণের গোলাম নয়? রামচরণের কথার কথা কহে—কার ঘাড়ে দুটা মাথা? তুমি লোকের কথা কহিও না।"

সুলোচনা কহিলেন,—

"আপনি বড় লোক তাহা আমি জানি—জানি বলিয়াই বলিতেছি আপনি দয়া করিয়া আমার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ করিবেন না। আমি গরিব বটে, কিন্তু আমি বেশ আছি। আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন। যদি আমার কোন দরকার পড়ে তাহা আপনাকে জানাইব।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাইতেছি, তুমি টাকা কয়টা লও।"

সুলোচনা বলিলেন,—

"টাকায় আমার কাজ নাই—উহা আমি লইব না।"

রামচরণ বলিলেন,—

"তোমার এত অভাব, এত অপ্রতুল—তুমি টাকা লইবে না, এ কি কাজের কথা? সে কি, মারা পড়িবে নাকি? লও, টাকা লও।"

সুলোচনা বলিলেন,—

"আমার অভাব নাই, অপ্রতুল নাই, টাকাতেও কাজ নাই।"

রামচরণ কহিলেন,—

"আমি আর কি জানি না। তোমাদের খবর আমি সর্ব্বদা লই। তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে শুনিয়াই আমি টাকা লইয়া আসিয়াছি। তোমার টাকা লইতেই হইবে। কেমন তুমি না লও দেখিতেছি।"

এই বলিয়া রামচরণ ডাক্তার সুলোচনার হস্তে টাকা দিবার

অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলেন। সুলোচনা পিছাইয়া গেলেন, রামচরণ আরও অগ্রসর হইলেন। সুলোচনার দেহ ভয়ে ও ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল তাঁহার বিলুপ্ত শ্রী পুনরায় দেখা দিল। ললাট ও বদন রাগরঞ্জিত হইল। তিনি বলিলেন,—

"আমি টাকা লইব না বলিতেছি, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছি—তুমি শুনিতেছ না। আমি অগত্যা চীৎকার করিয়া গ্রামের সমস্ত লোক জড় করিব। যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও।"

এই বলিয়া সুলোচনা বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। রামচরণ ডাক্তার বহুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে কি ভাবিয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন। গমন কালে বাহিরের দ্বার সজোরে রুদ্ধ করিলেন এবং বলিয়া গেলেন,—

"আচ্ছা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন শরৎকুমারীর কোন আহার হয় নাই বলিলেই হয়। কখন একটু আদটু মিছরি খাইয়া আছেন। শরৎ আপনাদের অবস্থা বুঝিতেছে এবং তাহার ভাবনায় জননীর কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছে তাহাও উপলব্ধি করিতেছে সুতরাং যতদূর সম্ভব যত্ন করিয়া নিজের কোন ক্লেশ জননীকে জানিতে দিতেছে না। ক্ষুধার ক্লেশে বালিকার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে কিন্তু জননীকে বলিলে তিনিই বা কি করিবেন ভাবিয়া, বালিকা বিজাতীয় যন্ত্রণা মনেই চাপিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র মানবদেহ যতদূর কষ্ট সহিতে পারে,

শরৎকুমারী ততদূর সহ্য করিল, তাহার পর অধুনা শরতের কষ্ট সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিল। সুলোচনা কন্যার কষ্ট সম্পূর্ণই বুঝিতে পারিতেছেন এবং সে জন্য তাঁহার ক্লেশ শরতের ক্লেশের অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প হইতেছে না। কিন্তু উপায় কিছুই দেখিতেছেন না।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। তখন শরৎ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন দিয়া আপনা আপনি জল বহিতে লাগিল, চৈতন্য ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত হইতে লাগিল, এবং সর্ব্ব শরীর দিয়া নিরন্তর ঘর্ম্ম-বারি বিনির্গত হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে শরৎ বলিল,—

"ক্ষুধায় মরি যে মা? কথা কহিতে পারি না যে আর।"

সেই মরণাপন্ন কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া সুলোচনা অধোবদনে রোদন করিতে লাগিলেন। শরতের জিহ্বা, কণ্ঠ, তালু শুষ্ক—কথা জড়তাপূর্ণ, শরৎ আবার বলিল,—

"এত করিয়া বাঁচাইলে মা, কিন্তু আজি আর বাচাইতে পারিলে না। ওঃ মাগো।"

কি ভয়ানক কণ্ঠস্বর। এ তো মুমূর্ষু ব্যক্তির স্বর। তবে কি শরৎ বাঁচিবে না? হা বিধাতঃ।

সুলোচনা কি করিবেন? সংসার অন্ধকার—কোন দিকে বিন্দু মাত্র আশা নাই, কোন দিকে কোন ভরসা-স্থল নাই। তিনি এখন ভাবিতেছেন, "আগে কেন মরি নাই।" মরণ হউক বা না হউক, ভরসা কিছু থাকুক বা না থাকুক, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে সংকল্প করিলেন। চেষ্টা কি? এ দ্বিপ্রহর রাত্রে, ঘোর অন্ধকারে কোথায় কি চেষ্টা সম্ভব? তিনি ভাবিলেন, লোকের বাড়ী বাড়ী ফিরিবেন, সকলের দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিবেন, এবং যেরূপে হউক, কিঞ্চিৎ আহার্য্য ভিক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিবেন। এই

তাঁহার শেষ সংকল্প। "ভয় কি মা, আমি এখনই তোমার খাবার আনিতেছি।" এই বলিয়া অনাথিনী, দুঃখিনী জননী ক্ষুৎপিপাসা কাতর, মুমূর্ষু কন্যার বদন চুম্বন করিয়া, হৃদয়কে অসাধ্য সাধনে প্রস্তুত করিয়া, সকল বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা অমূলক জ্ঞান করিয়া সেই গভীর রাত্রি কালে ভবন-দ্বারের বাহিরে শিকলি দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য—ভিক্ষা দ্বারা খাদ্য সঞ্চয়।

রাত্রি ঘোর অন্ধকারময়ী। সেই পল্লীগ্রামের জনশূন্য সংকীর্ণ পথে সুলোচনা সেই রাত্রে একাকিনী বাহিরিলেন। দুই পদ মাত্র অগ্রসর হইতে না হইতে একটা গ্রাম্য কুকুর বিকট শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখনই সুলোচনার বোধ হইল, যেন একজন লোক পথের একধার হইতে অপর ধারে গমন করিল। কে সে মানুষ? সে কি কোন শরীরী মানব না প্রেত আত্মা? সে যাহাই হউক, সুলোচনার হৃদয় প্রথমতঃ ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল! লোকটা রামচরণ ডাক্তার নয় তো। ভূত বা প্রেত, ব্যাঘ্র বা ভল্লুক, সকলের অপেক্ষা রামচরণ ডাক্তারই সুলোচনার অধিক ভয়ের কারণ। ভাবিলেন, রামচরণ ডাক্তারই যদি হয়, তাহা হইলে, তাহাকেও উপস্থিত বিপদের কথা জানাইলে অবশ্যই সে দয়া করিবে। এ দুঃখের বিবরণ শুনিলে ভূত হউক, রামচরণই হউক, সকলেই কাতর হইবে, সকলেই সহায়তা করিবে। অতএব ভয় কি। সুলোচনা স্থির করিলেন, 'যে সম্মুখ দিয়া গেল সে যেই হউক, তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।' কই আর তো কাহারও সাড়া শব্দ নাই। তবে ও কিছু নয়—দেখিবার ভুল। সুলোচনা আবার কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় মনুষ্যের পদধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি সচকিতে চারিদিকে চাহিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে না পান, তথাপি তিনি করযোড়ে কাতর ভাবে বলিলেন,—

"দেব হও, দৈত্য হও, ভূত হও, মানুষ হও, যে হও আমার

শরৎকুমারী খাদ্যাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় মারা পড়িতেছে, তোমরা আমাকে সাহায্য কর—ভিক্ষা দেও।"

সুলোচনা নীরব হইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার করুণ প্রার্থনায় উত্তর দিল না। তিনি 'হা বিধাতঃ' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অগ্রসর হইবার নিমিত্ত পা বাড়াইলেন। তখনই এককালে চারিদিক হইতে চারি ব্যক্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি বলিলেন,—

"কে—কে আপনারা? শরৎকে খাইতে দিবেন? কি আনিয়াছেন দিন। বাছা ছট্ফট্ করিতেছে।"

লোকেরা সুলোচনার কথার কোনই উত্তর দিল না এবং তাঁহাকে আর কথা কহিতেও অবকাশ দিল না। তখনই তাঁহার মুখে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তিনি একবার অস্পষ্ট ভাবে বলিলেন,—"শরৎ।"

আর কথা তিনি বলিতে পারিলেন না। লোক কয়জন তাহার পর বিশেষ সাবধানতা সহকারে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিল। সুলোচনার সংসারের একমাত্র বন্ধন শরৎকুমারী সেই দশায়, এখানে সংসারবোধবিহীনা শরতের এক মাত্র ভরসা সুলোচনার এই দশা।

প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরূপা গোয়াল ঘরের ফাঁক দিয়া দেখিয়া বলিল,—

"এদিকে, এদিকে। কি ভাগ্য!"

লোকটা ছাতা বন্ধ করিয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ করিল। সুরূপা বলিল,—

"ডাক্তার বাবু, কি ভাগ্য আজি, এদিকে যে আজি পদধূলি পড়িল!"

তখন আগন্তুক রামচরণ ডাক্তার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন,—

"আর তো পারি না। তোমার বাড়ী আর নাহক আসিব না। লাভ কেবল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা। তুমি আমার কষ্ট দেখিতে ভালবাস। আমাকে এমন করিয়া আসিতে বলার চেয়ে, আসিতে না বলাই ভাল।"

সুরূপা বলিল,—

"কি করি—ডাক্তার বাবু, আমার কি অসাধ? মেয়ে যে কিছু-তেই বুঝে না। আমার এই বয়সে আমি বিস্তর মেয়ে দেখিলাম, কিন্তু এমন একগুঁয়ে মেয়ে কখন দেখি নাই। কি জানি রাধারমণ লক্ষ্মীছাড়া বেটা ওকে কি মন্ত্র দিয়েছে।"

ডাক্তার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"ঐ এক কথা। ও কথা শুনিয়া আর কাজ নাই। বুঝিলাম, তুমি আমার প্রতি সদয় নও। তা নহিলে, এও কি হয়? তুমি পার না কি? তোমার কথা সোহাগ শুনে না, কেমন করিয়া বিশ্বাস করি।"

সুরূপা বলিল,—

"ধর্ম্মসাক্ষী, ডাক্তার বাবু, আমার দোষ নাই আমি পাখী পড়াইবার মত করিয়া প্রতিদিন সোহাগীকে বুঝাই। কত ভয় দেখাই, কত লোভ দেখাই, কত গহনা, কত টাকার কথা বলি,

কিন্তু সে কোন কথাই কাণে ঠাঁই দেয় না। উত্তরের মধ্যে কেবল কান্না। কি করি বল দেখি ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বলিলেন,—

"আমি ঢের দেখিয়াছি, ঢের জানি। কেন তুমিই কি জান না? প্রথম প্রথম ঐরকমই হ'য়ে থাকে। তার পর একবার চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেলে পোষাপাখীর মত উড়ে এসে গায় বসে।"

স্বরূপা বলিল,—

"একথা সত্য। আমার বোধ হয়, একবার রাজি করিতে পারিলে আর ভাবনা ভাবিতে হইবে না। কিন্তু সেই একবারই তো শক্ত কথা।"

রামচরণ বলিল,—

"শক্ত কিছুই নয়। তুমি একবার আমাকে সুবিধা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে দেখাইয়া দিই আমি কেমন কাজের লোক।"

স্বরূপা বলিল,—

"তাই ভাল। আজিকে আমি একবার ভাল করিয়া বলিয়া দেখি। কোন ভাল ফল ফলে ভালই, না হয় কালি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তুমি নিজে যা হয় করিও।"

রামচরণ বলিল,—

"বেশ।"

তাহার পর রামচরণ স্বরূপার নিকটে আসিয়া চুপি চুপি অনেক কথা বলিল। উভয়ে অনেক হাসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়া গেল।

"সোণা দানা আমি চাই না। ভিক্ষা করিয়া গাছতলায় রাঁধিয়া খাইব সেও ভাল, তথাপি আমি ধর্ম্মের, বিশ্বাসের মাথা খাইব না। তুমি আর যদি আমাকে ওকথা বল, তাহা হইলে, হয় আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব, না হয় জলে ডুবিয়া মরিব।"

স্বরূপা বলিল,—

"সতীত্বের কুঁড়ি! দেখি কেমন তোর ধর্ম্ম থাকে। আমি কথা কইলে তোমার সব না—আমি আর কথা কইব না।"

এই বলিয়া স্বরূপা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সোহাগিনী সেই স্থানে বসিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি ৯টা হইবে। রাধারমণ বসিয়া ভাত খাইতেছে; সম্মুখে সোহাগিনী বসিয়া আছে। ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। দরিদ্রের ঘর। তথায় শোভানীয় বা দর্শনীয় বস্তু কিছুই নাই। রাধারমণ জানে, সোহাগিনী তাহার ঘরে যে শোভা বিস্তার করিয়া আছে. ভূমণ্ডলে তাহার তুলনা হইতে পারে এমন সামগ্রী কুত্রাপি নাই আর সোহাগিনী জানে, যাহার রাধারমণ আছে, এ জগতে তাহার নাই কি? এমন প্রেমপূর্ণ, এমন মমতাপূর্ণ, এমন আত্মবোধবিহীনতাপূর্ণ, এমন স্বার্থত্যাগপূর্ণ এবং এমন স্বার্থপরতাপূর্ণ যে সংসার, বোধ করি, দিল্লীশ্বরের সংসার অপেক্ষা সুখ তথায় লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে।

রাধারমণ লোকটা দেখিতে সুপুরুষ। বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে।

বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। চক্ষু আয়ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। দেহ দীর্ঘ, পরিণত এবং কৃশতা বা রুগ্নভাব বিবর্জ্জিত।

রাধারমণ ভাত খাইতেছে আর সোহাগিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে। এক এক গ্রাস ভাত মুখে দিতেছে ও যতক্ষণ তাহা উদরস্থ না হইতেছে ততক্ষণ রাধারমণ থাকিয়া থাকিয়া নিরাভরণা স্বর্ণকান্তি সোহাগিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে। ভাত খাইবার উপকরণ নিতান্ত অল্পই ছিল। সোহাগিনী বলিল,—

"ভাত কি আমার মুখে?"

রাধারমণ বলিল,—

"তরকারী বড় নাই তো। ভাত মুখে দিয়া তোমার মুখপানে চেয়ে থাকিলে, কি করিতেছি তাহা ভুলিয়া যাই। কাজেই তরকারীর কথা মনেও পড়েনা।"

সোহাগিনী হাসিয়া বলিল,—

"একথা আমাকে আগে কেন জানাও নাই। এমন সহজ উপায় থাকিলে আমি আর তরকারী রাঁধিব কেন। কালি হইতে বেশ করিয়া প্রদীপে জোর আলো করিয়া তোমার সম্মুখে বসিয়া থাকিব, তুমি দেখিও আর ভাত খাইও।"

রাধারমণ বলিল,—

"যদি শ্রম বাঁচাইতে তোমার মন হয়, তাহা হইলে আরও পার। ভাত না রাঁধিলেও চলে। আমি আসিতে আসিতে যে দিন তুমি গল্প করিতে আরম্ভ কর, সে দিন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে পড়ে না। এ উপায়ে ভাতও বাঁচান যায়।'

সোহাগ বলিল,—

'না, তাতে আমার কাজ নাই।'

রাধাচরণ বলিল,—

'কেন?'

সোহাগ বলিল,—

"তাহলে আমার মদনমোহন রোগা হবে, শুকাইয়া যাবে, অসুখ হবে। তা হবে না। আমার মদনমোহন খুব ভাত খেলে আমি ভাল বাসি।"

রাধারমণের আহার কার্য্য শেষ হইল। উঠিয়া বাহিরে হাত মুখ ধুইতে গেল। সোহাগিনী পাথরখানি তুলিয়া সেই স্থানে উপুড় করিয়া রাখিল এবং ভোজনাবশিষ্ট সকল বাহিরে ফেলিয়া দিল। রাধারমণ হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া ঘরে আসিলে সোহাগ তাহাকে একটা পান দিল। পান মুখে দিয়া রাধারমণ তামাক সাজিতে বসিল। প্রদীপের নিকট চকমকির বাক্স লইয়া রাধারমণ বসিল এবং কথা কহিতে কহিতে তামাক সাজিতে লাগিল। অন্যমনস্ক হইয়া রাধারমণ যে ঘরে তামাক থাকে সেই ঘরে কলিকার গুল ঢালিয়া ফেলিল এবং যে ঘরে কয়লা থাকে তথায় তামাক খুঁজিতে লাগিল। তাহার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার ভাত এবং ভাতের তরকারী সোহাগ তাহার সম্মুখে তাকাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং রাধারমণের এই দশা। অনেকক্ষণ পরে রাধারমণ বলিল,—

"সোহাগি, আজি কি তামাক ফুরাইয়াছে?"

সোহাগী ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিতেছিল। হাসি লাগিয়া বলিল,—

"হাঁ, নাই হয় ত।"

তখন অগত্যা রাধারমণ চকমকি ছাড়িয়া আসিল এবং হুঁকা কলিকা একপার্শ্বে রাখিয়া দিল।

তখন সোহাগী হাসিতে হাসিতে চকমকি হাতে লইয়া রাধা-রমণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিল,—

"একি? চক্ষু কোথায় রাখিয়া তামাক খুঁজিয়াছিলে?"

রাধারমণ বলিল,—

"তাই তো, অনেক তামাক আছে দেখিতেছি। আগে দেখিতে পাই নাই, সে তোমারই জন্য।"

তখন রাধারমণ পুনবায় উঠিয়া তামাক সাজিতে গেল। সোহাগী কলিকায় তামাক সাজিতেছে দেখিয়া রাধারমণ একখানি কয়লা লইয়া প্রদীপে ধরাইতে লাগিল। প্রথমে দেখিয়া ঠিক করিয়া হাত, কয়লা ও প্রদীপ যথাসন্নিবিষ্ট করিল। কিন্তু তখনই তাহার নয়ন ও মন যেখানে সোহাগীর অঙ্গুলি তামাক কুচাইয়া কলিকায় দিতেছে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় তামাকের কৃষ্ণবর্ণ, সোহাগীর নখারের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ এবং তাহার অঙ্গুলির চম্পকবর্ণ অনিয়মিত ক্রমে সমবেত হইয়া মনোহর শোভা সমুৎপাদন করিতেছে। রাধা-রমণের চক্ষু কি সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও থাকিতে পারে? চক্ষু সেইখানেই গেল। সুতরাং হস্ত ও তৎসংসৃষ্ট কয়লা ক্রমে প্রদীপ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সোহাগী এ রহস্য দেখিল এবং প্রবর্দ্ধমান হাস্যের বেগ অতি যত্নে সম্বরণ করিয়া বলিল,—

"কই, আগুণ দেও।"

রাধারমণ তাড়াতাড়ি কয়লায় ফুঁ দিতে গিয়া দেখে, কয়লা যেমন কালো তেমনি কালো। সোহাগী হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং রাধারমণের গলা জড়াইয়া ধরিল। রাধারমণ তাহাকে আলি-ঙ্গন বদ্ধ করিয়া ফেলিল। উভয়ে অনেকক্ষণ এইরূপ থাকিল। তাহার পর সোহাগী বলিল,—

"তামাক খাও।"

রাধারমণ উঠিয়া তামাক সাজিল। সোহাগী চৌকীর উপর যে মাদুর বিছান ছিল, ভিজা গামছা দিয়া একবার তাহা মুছিয়া ফেলিল। রাধারমণ তামাক খাইয়া শয্যায় আসিয়া বসিল। সোহাগিনীও ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বসিল, বসিয়া ধীরে ধীরে অদ্যকার সমস্ত বৃত্তান্ত রাধারমণকে জানাইল এবং আশঙ্কা ও অভিমান হেতু কাঁদিয়া ফেলিল। সাদরে রাধারমণ সোহাগিনীর নয়নের জল মুছাইয়া দিল এবং বলিল,—

"এত ভাবনা কি? আমি গরিব বটি, কিন্তু আমি যাঁহার আশ্রিত তিনি দয়ার সাগর। তাঁহার গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার প্রধান ভরসা ঈশ্বর, তাহার পর ভরসা হেমেন্দ্র বাবু। আমার কখন মনে হয় না যে, আমি সহায়হীন বা নিরাশ্রয়। তোমার ভয় কি? যখন বিপদ বুঝিব তখন বাবুকে জানাইব, তিনি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেনও—করিবেনও। ভাবনা কি?"

সেদিন এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা ২॥টা, ৩টার সময়ে সোহাগিনী আপনার ঘরের ভিতর শুইয়া আছে। একটু ঘুমও আসিয়াছে। বড় গ্রীষ্ম। সোহাগিনীর শরীরের স্থানে স্থানে ঘর্ম্ম বাহিরিতেছে। ললাটে স্থূল স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সকল মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ণায়ত, পরিপুষ্ট দেহ যৌবন-শ্রীতে ঝলমল করিতেছে। গ্রীষ্ম ও মানবহীনতা হেতু সোহাগিনীর শরীরের উর্দ্ধাংশ শিথিল-বাস রহিয়াছে। নিদ্রা সুন্দরীর স্বভাব—কোমল কমনীয় কান্তিতে যেন আরও কমনীয়তা ঢালিয়া দিয়াছে। সুন্দরীর বদনে পাপ-সংস্পর্শ-বিহীনতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে। পবিত্রতা সকল অঙ্গে মাখা রহিয়াছে। সুন্দরী ঘুমাইতেছে।

ধীরে ধীরে, অতি সতর্কভাবে, একজন লোক গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া সেই অনাবৃত-অবয়বা সুন্দরীর নিটোল সৌন্দর্য্য—ভুবনমোহিনী কান্তি একবার হৃদয় ভরিয়া দেখিল। দেখিবা-মাত্র তাহার সর্ব্ব শরীর দিয় তাড়িত-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাহার

পাশব মূৰ্ত্তি আরও পশু ভাব ধারণ করিল। সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঘরের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। ধীরে ধীরে আসিয়া সুন্দরীর শয্যায় উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে সুন্দরীর পবিত্র অঙ্গে আপনার দুষ্কৃতি-রাগ রঞ্জিত, কলঙ্কিত হস্ত সমর্পণ করিল। স্পর্শ মাত্র সোহাগিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বেগে শয্যাত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং ঘরের এক প্রান্তে গিয়া,

"একি—একি?—মা—মা।"

বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল,—

"ভয় কি? মা কোথায়? সে সব জানে, ভাবনা কি? এদিকে এস।"

সোহাগ বলিল,—

"ডাক্তার বাবু, আপনার একি ব্যবহার? আপনি কোন্ সাহসে দরজা বন্ধ করিয়া আমার ঘরে আসিলেন? আপনি এখনি চলিয়া যাউন।"

ডাক্তার অচল। চলিয়া যাইতে সে আসে নাই, এক কথায় সে চলিয়া যাইবে কেন? বলিল,—

"যাও যাও করিতেছ কেন? ভয় কিসের? এদিকে এস, তোমার মা সব জানে, সে না বলিলে কি আমি এসেছি।"

সোহাগ বলিল,—

"মা বলিয়া থাকে বলুক, আমি মার কথা শুনি না। আমার যেমন মন, যেমন ইচ্ছা তেমনি কাজ আমি করিব। আপনাকে আবার বলিতেছি, আপনি চলিয়া যাউন।"

ডাক্তার বলিল,—

"ছি! তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ দেখ্‌ছি যে! তোমার এত ভয় কিসের?"

ডাক্তার উঠিয়া সোহাগের দিকে চলিল। সোহাগ বলিল,—

"ডাক্তার বাবু! এ সকল মতলব ত্যাগ করুন। যাহা হইবে না, যাহা ভাল নয়, যাহা পাপকার্য্য তাহা কেন করেন। আমি বলিতেছি, যতক্ষণ আমি বাঁচিয়া থাকিব ততক্ষণের মধ্যে আমাকে স্পর্শ করিতে কখনই আপনার সাধ্য হইবে না। এখনও বলিতেছি, আপনি চলিয়া যাউন।"

ডাক্তার বলিল,—

"এত কষ্ট করিয়া যদি তোমাকে আজি হাতে পাইয়াছি, তবে চলিয়া যাইব কেন?"

এই বলিয়া বেগে গিয়া সোহাগের হস্ত ধারণ করিল। সোহাগ সজোরে তাহার হস্ত হইতে হস্ত ছাড়াইয়া লইল এবং দৌড়িয়া দরজা খুলিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে গেল। তখন ডাক্তার দরজার গায়ে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হস্তে সোহাগের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। সোহাগ হাত ছাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সোহাগ কাঁদিতে লাগিল। বলিল,—

"আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু, আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না। আপনি অত্যাচার করিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। আমি গরিব, আমি দুঃখিনী, আমাকে প্রাণে মারিয়া আপনার কি লাভ?"

কত রোদনই সোহাগ করিতে লাগিল, কত কাকুতি মিনতিই সে করিল। কিন্তু নরপ্রেত ডাক্তার কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। সে তখন পশু—অথবা পশু অপেক্ষাও অধম। ডাক্তারের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় সোহাগ অনেক যত্ন, অনেক শ্রম করিল। শ্রমে, আশঙ্কায়, রোদনে এবং কাতরতায় সোহাগ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন সোহাগের গাত্র-বসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কেশপাশ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভয়ে শরীর কম্পিত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া স্বেদ-বারি বাহিরিতেছে, এবং ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। তখন সেই অবসন্না, ধর্ম্মভীতা বালিকা সাহায্যের নিমিত্ত

সকলকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কেহই আসিল না। তখন দেহ ও মনের শক্তি এককালে শিথিল হইয়া গেল—মূর্চ্ছা যায় যায় অবস্থা। তাহার বোধ হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, ধূমময়—অন্ধকারময় সংসার কেবল ঘুরিতেছে, সে যেন একটা সামান্য কীট, সামান্য কীটেরও যে শক্তি আছে তাহার যেন তাহাও নাই। সে হতাশ হইয়া বলিল,—

"হা দয়াময়, হা ভগবান! এই কি তোমার দয়া? দুঃখিনীর কথা তুমি শুনিলে না? দুঃখিনীকে রক্ষা করিতে তুমি কোনই সাহায্য করিলে না?"

আর কথা বালিকা বলিতে পারিল না। সে চেতনাহীন হইয়া পাষণ্ড ডাক্তারের অঙ্কে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না। স্বর্গে সে কথা ধ্বনিত হইল! ঈশ্বর তাহার সহায় হইলেন। তখনই সজোরে বারম্বার বাহির হইতে দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল, দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। এককালে চারি ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথম প্রবেশকারী বামারমণ। সে বেগে,

"সোহাগি—সোহাগি আমার—ভয় কি? বাবু আসিয়াছেন।" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সোহাগীকে কোলে লইয়া বসিল এবং সযত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

তখন দ্বিতীয় প্রবেশকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিলেন,—

"লোকটা কে?"

ডাক্তার তখন এক পার্শ্বে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান।

একজন অনুচর বলিল,—

"রূপনগরের রামচরণ ডাক্তার।"

হেমেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"বাঁধ্ বেটাকে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামচরণ ডাক্তারের কীর্ত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সন্নিহিত গ্রাম সকলের দরিদ্র অধিবাসিবৃন্দ ভয়ে বড় একটা কোন কথা বলিত না, এবং জানিয়াও জানিত না। কিন্তু এখন তাহাদের ভয় অনেকটা ঘুচিয়াছে। ভয় দূর হইবার এক প্রধান কারণ হেমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ভরসা। তাহারা বুঝে ও জানে যে, হেমেন্দ্র বাবুর তুলনায় রামচরণ ডাক্তার একটা কীটমাত্র। সেই হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় যখন ডাক্তারের বিরোধী, তখন ডাক্তারের আর নিস্তার নাই। তাহারা বহুকাল ধরিয়া ডাক্তারের নানা অত্যাচার দেখিয়াছে ও নীরবে সহ্য করিয়াছে। বহুকালের অন্তর্যাতনা এখন ব্যক্ত করিবার সুযোগ হইয়াছে। তাদৃশ সুযোগ হইয়াছে বলিয়া, আজি চারি পাঁচখানি ক্ষুদ্র গ্রামবাসী নরনারী কেবল রামচরণ ডাক্তারের চরিত্র, তাঁহার দুষ্কৃতি ও তৎকৃত অত্যাচারের আলোচনা করিতেছে। তাই বলিতেছি, আজি রামচরণ ডাক্তারের কীর্ত্তি বড় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আজি ঘাটে পথে কেবল ভাগ্যবান রামচরণ ডাক্তারের কথা। রামচরণ ডাক্তারকে হেমেন্দ্র বাবু ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, সে বেত খাইতেছে, সে ক্ষতবিক্ষত-কায় হইয়াছে; সকল লোকের মুখে কেবল এইরূপ প্রসঙ্গ।

কেবল রূপনগরে রামচরণের ভবনের অনতিদূরস্থ একটী ক্ষুদ্র কুটীর-মধ্যে অন্য ভাব। তথায় এক সুন্দরী কামিনী অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যাকুল ভাবে গৃহমধ্যে বেড়াইতেছেন, থাকিয়া থাকিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, আবার তখনই দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার হস্তের অঙ্গুলি সকল আপনা আপনি নড়িতেছে, সমস্ত দেহটা এক একবার কম্পিত হইতেছে।

বহু রোদন হেতু তাঁহার লোচন রক্তবর্ণ হইয়াছে। তিনি ক্ষণে ক্ষণে সজোরে গৃহ মধ্যস্থ যে কোন সামগ্রীকে উভয় হস্তে ধারণ করিতেছেন এবং ছাড়িয়া দিতেছেন। তাঁহার অস্থিরতার সীমা নাই।

এই কামিনী ক্ষীণাঙ্গী। তাঁহার দেহের বর্ণ চম্পকের ন্যায় সুগৌর, লোচনদ্বয় আয়ত ও সতেজ। মুখশ্রী অনুপম। সুন্দরীর হৃদয়ে বিজাতীয় জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার নিদর্শন তাঁহার বদন পরিব্যক্ত করিতেছে। তিনি অস্থিরতা সহকারে আবার একবার দ্বার খুলিলেন, একবার চারিদিকে চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখনই আবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি দ্বার রুদ্ধ করিবার অত্যল্প কাল পরেই দ্বারে মৃদু আঘাত হইল। বাহির হইতে কে বলিল,—

"দরজা খোল।"

কামিনী ব্যস্ততা সহকারে দ্বার খুলিল এবং দ্বার খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি দেখিলে? কেমন আছেন? মারিয়াছে কি? বড় কষ্ট পাইতেছেন কি? ধরিয়া বাঁধিয়াছে নাকি?"

যে স্ত্রীলোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল, সে প্রথমে স্থির হইয়া বসিল, তাহার পর বলিল,—

"আছেন ভাল।"

কামিনী আবার জিজ্ঞাসিল,—

"আসিতেছেন না কেন? তাঁহাকে কি সাজা দিয়াছে? লোকে বলিতেছে, তাঁহাকে মারিয়া জখম করিয়াছে। কেদারের মা, সত্য করিয়া বল, তাঁহাকে কেমন দেখিলে?"

"তাঁহাকে মারে নাই, জখমও করে নাই। অপমান, তিরস্কার অনেক করিয়াছে। আজি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। বিকাল বেলা হয় ত আসিবেন।"

তখন কামিনীর হৃদয়-জ্বালা অনেক শান্ত হইল। সে 'আঃ' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার অস্থিরতা অনেক কমিয়া গেল। তখন সে বলিল,—

"হে ভগবান্, এ কষ্ট তো আর সহে না! যাহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া ভাল বাসি, যাহাকে সতত হৃদয় মধ্যে রাখিতে পারিলেও তৃপ্তি হয় না, তাহার কষ্টের সংবাদে প্রাণ যায় যে!"

কেদারের মা বলিল,—

"তুমি তো তাঁর জন্য মর, কিন্তু তিনি তোমার কে? তুমি বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা। কত লোভ দেখাইয়া, কত প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া তিনি তোমার ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই নষ্ট করিয়াছেন। তোমার আশা কি? তাঁহার নিকট হইতে প্রাণের ভালবাসা তুমি চাও; ফল কি দাঁড়াইয়াছে? তুমি এখন দুই দিন অন্তরও একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে কর। তিনি এখন তোমার কাছে আসিতে হইলে ত্যক্ত হন। তাঁহার মন এখন কেবল নূতন নূতন ফুলের মধু খাইতে ব্যস্ত, তিনি এখন কেবল নূতন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, তাঁর জন্য মর কেন?"

কামিনী অনেকক্ষণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—

"আমি মরি কেন জানি না। কে জানে রামচরণ আমার হৃদয়ে কি আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছে? আমি এক দণ্ড রামচরণকে না দেখিতে পাইলে সংসার অন্ধকার দেখি—রামচরণ আমার সর্ব্বস্ব। সেই রামচরণ আমাকে মাথায় করিয়া আনিয়া পা দিয়া ঠেলিতেছে। রামচরণ আমাকে স্বর্গে তুলিয়া এখন একেবারে নরকে ফেলিয়া দিতেছে, রামচরণ এখন আমার পানে একবার ফিরিয়া তাকাইতেও চাহে না—আমি এখন তাহার চক্ষের বিষ হইয়াছি।"

"রামচরণ যদি এখন তোমাকে ঘৃণা করে বুঝিয়াছ, তবে আর

তাহার ভাবনা ভাবিয়া শরীর পাত করিও না। সে শঠ, সে প্রব ঞ্চক, কেবল পর মজানই তাহার কাজ। তাহাকে ক্রমে ক্রমে ভুলিতে—মন হইতে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা কর।"

কামিনী বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিয়া বলিল,—

"তাহাকে ভুলা—তাহাকে মন হইতে দূর করিব কেমন করিয়া? হৃদয় চিরিয়া ফেলিলেও তাহা হইতে রামচরণের মূর্ত্তি নষ্ট হইবে না তো। রামচরণকে ভুলিতে পারিব না; রামচরণের নাম আমার জপমালা। তাহার মূর্ত্তি আমার দিবানিশির ধ্যান। আমি তাহাকে ভুলিতে পারিব না। কিন্তু রামচরণের ব্যবহার আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি যাহাকে এমন করিয়া প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসি, আমি যাহার প্রেমের জন্ত ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছি, যাহার চরণে আমি পোষা কুকুরের ন্তায় সতত অনুগত হইয়া থাকি, সে যে আমাকে এমন করিয়া ঘৃণা করে, আমাকে আর পায়ের নখেও স্থান দেয় না, এ কষ্ট আর সহিতে পারি না।"

কামিনী যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেই খানেই বসিয়া পড়িল এবং বসিয়া বসিয়া অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। কেদারের মা বলিল,—

"তুমি ধন্ত, তাই রামচরণের এই ব্যবহার এতদিন সহ্য করিতেছ। এ জন্ত যা হয় একটা উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। রাম-চরণ তোমাকে যেমন জ্বালাইতেছে, তার তেমনি সাজা আবশ্যক। সে যা হয় পরে করিও। এখন উঠ, হাত মুখ ধোও, খাওয়া দাওয়ার চেষ্টা দেখ। আমি এখন আসি।"

কেদারের মা চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা অপরাহ্ন। সূর্য্য পশ্চিমাকাশের নিম্ন ভাগে চলিয়া পড়িয়া ক্রীড়াশীল বালকের ন্যায় নানারঙ্গের মেঘের সহিত খেলা করিতেছেন। তাঁহার সমুজ্জ্বল হাস্য এখন আর সমতল ও নিম্নভূমি সকল দেখিতে পাইতেছে না। বৃক্ষ চূড়া, প্রভৃতি উন্নত অবস্থাপন্ন পদার্থপুঞ্জই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের প্রশান্ত হাস্য জ্যোতিঃ দর্শন করিতেছে।

সেই গৃহমধ্যস্থ শয্যার কামিনী অধোবদনে শুইয়া আছে। তাহার লোচন দিয়া অবিরল জল পড়িয়া উপাধান সিক্ত করিতেছে।

রামচরণ ডাক্তার হেমেন্দ্র নারায়ণের নিকট অব্যাহতি লাভ করিয়া রূপনগর আসিয়াছেন কিন্তু তিনি কামিনীর নিকট আইসেন নাই। কামিনী ভাবিয়াছিল, রামচরণ রূপনগরে আসিয়াই শত কর্ম্ম ফেলিয়া অগ্রে তাহার নিকট আসিবেন। তাহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। রামচরণ বেলা ১০ টার সময় রূপনগর আসিয়াছেন, এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ নাই। কামিনী আরও ভাবিয়াছিল, তিনি না জানি কতই লজ্জিত হইয়াছেন। হয়ত তিনি আমার নিকট কথা কহিতেই কাতর হইবেন। আমি তাঁহকে কোন অনুযোগ করিব না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলেই আমি পরম লাভ জ্ঞান করি, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই আমি স্বর্গ-সুখ মনে করি। তাঁহার যত দোষ থাকুক, তিনি আমার দেবতা; তাঁহাকে দোষের কথা বলিয়া লজ্জা দিব না।

কামিনী অনেক আশা করিয়াছিল। অনেক আশায় অনেক ছাই পড়িয়াছে। হৃদয়ের স্থিরতা—দৃঢ়তা আর কতক্ষণ থাকে? কামিনী হতাশ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কামিনীর যখন এই অবস্থা তখন অতি ব্যস্ততা সহকারে সেই ঘরে এক জন লোক প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি রামচরণ। রামচরণের

আগমন মাত্র কামিনী প্রথমে ঘাড় তুলিয়া দেখিল লোকটা কে? সে রামচরণকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া দৌড়িয়া আসিয়া রামচরণের গলা জড়াইয়া ধরিল এবং বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে যত অভিমান ছিল, একটু একটু করিয়া মনে যত রাগ জমিতেছিল, সকলই উড়িয়া গেল।

রামচরণ গলা হইতে কামিনীর হাত ছাড়াইল এবং কামিনীর শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিল। বলিল,—

"আমার কাজ আছে। আমি এখনই যাইব। তুমি ভাল আছ তো?"

কামিনী আবার চক্ষুর জল মুছিল। সে বহুদিন হইতে রামচরণের অনাদর ভুগিয়া আসিতেছে। সুতরাং অনাদর তাহার পক্ষে নুতন নহে। কিন্তু আজি—এই বিপদের পর—এত অপমানের পর—ক দিনের পর কামিনী ভাবিয়াছিল রামচরণ তাহার প্রতি অনাদর করিবে না, রামচরণ তাহাকে মনের সমস্ত জ্বালা জানাইবে এবং সহানুভূতি পাইবা শান্ত হইবে। রামচরণের কণ্ঠস্বর ভাব শুনিয়া কামিনী বুঝিল, আজিও রামচরণ সেই রামচরণ। প্রণয়ের সুশীতল সলিল সিঞ্চনে তাহার বিশুদ্ধ হৃদয় আজি কিয়ৎ-পরিমাণে শান্ত হইবে বলিয়া সে আশা করিয়াছিল। বুঝিল আশা সফল হইবে না। এ বুঝা আজ নুতন নহে। বহু দিন—বহুদিন ধরিয়া কামিনী রামচরণের উপেক্ষা, অনাদর ভুগিতেছে। বহুদিন, বহু আশায় সে হতাশ হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া তাহার কাতর হৃদয় ক্ষত বিক্ষত ও মথিত হইয়াছে। আজি তাহার সেই ক্ষত বিক্ষত হৃদয় আরও একটু ক্ষত হইল মাত্র। সমুদ্রে শিশির-সম্পাত বৎ তাহা গণনায় আইল না। কামিনী বলিল;—

"প্রাণ আমার তোমার ভাবনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। আমি এ কয়দিন স্নান করি নাই, আহার করি নাই, নিদ্রা যাই নাই। তুমি দু দণ্ড বইস, তোমাকে দেখিয়া আমি প্রাণ জুড়াই।"

রামচরণ বলিল,—

"আমার ভাবনায় তুমি স্নান আহার কর নাই, সে তোমার নিতান্ত বোকামি। আমার জন্য ভাবনাটা কি? আমি মরিয়াছি কি? কোন্ বেটাই বা এমন আছে, যে আমাকে কোন কথা বলে? তুমি কি ভাব আমি ছোট লোক?"

কামিনী বলিল,—

"ঈশ্বর করুণ তোমার যেন কখন কোন বিপদ না হয়। তুমি যেন অক্ষয় পরমায়ু লইয়া সুখে থাক। লোকে নানা কথা বলে সেই সব শুনিয়াই ভয় হয়, ভাবনা হয়।"

রামচরণ বিরক্ত হইল। বলিল,—

"লোকে কি বলে? লোকে বলে আমি সোহাগী বৈষ্ণবীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, কেমন? খুব করিয়াছি—আবার করিব। তুমি লোকের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ। ভাবিয়াছ রামচরণ তোমার হাত ছাড়া হইয়া গেল। কেন রাম-চরণ কি তোমার কেনা গোলাম? আমি কি খতে পত্রে তোমার কাছে বিকিয়ে আছি? আমি যেখানে খুসি যাইব, যা খুসি তাই করিব, তাতে তুমি কথা কইবার কে? তুমি খাবে, পরবে, থাকবে। আমার উপর হুকুম চালাইতে বা আমার কথার কথা কহিতে তোমার ক্ষমতা নাই।"

কামিনী সমস্ত শুনিল। ভাবিল 'হৃদয় ফাটে না কেন? মানুষে এতও সহিতে পারে?' অনেক ক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—

"রামচরণ, প্রাণনাথ! অদৃষ্টে এত কষ্ট লেখা ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। আমি তোমাকে কে রকম ভাল বাসি তাহা অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কে জানিবেন। হৃদয় যদি দেখাইবার হইত, প্রাণের কথা যদি জানাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে রামচরণ, তোমাকে আমার হৃদয়ের ভাব দেখাইতাম,

প্রাণের কথা জানাইতাম। আমি হতভাগিনী। দুঃখে আমার জন্ম। আমি অতি বাল্যকালে বিধবা হইয়াছি। ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই বিসর্জ্জন দিয়া আমি তোমাকে প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম—তোমার প্রথমকার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, যে আমার দুঃখময় অদৃষ্টে এতদিনে সুখ দেখা দিল। আমি অতুল সুখ-সাগরে ভাসিলাম। কোন ক্ষতিই আমার ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না। আমি তোমার কথায় ভুলিয়া, তোমার ফাঁদে পড়িয়া, তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। কিন্তু রামচরণ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি এখন আমার কি দুর্দ্দশা না করিতেছ? তুমি আমাকে হৃদয়ের হৃদয়ে রাখিব বলিয়া আশা দিয়াছিলে—মনে পড়ে কি রামচরণ? তুমি আমাকে হৃদয়ের একমাত্র রাণী করিবে বলিয়াছিলে—সে কথা মনে আছে কি রামচরণ? তুমি আমার প্রেমের চিরদিন অধীন ও অনুগত থাকিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলে, কত আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিয়াছিলে, কত ফাঁদ পাতিয়াছিলে—তাহার কিছুই কি মনে নাই রামচরণ? মনে থাকুক বা না থাকুক, আমি তোমাকে সকল কথা মনে করাইয়া দিতে চাহি না। আমি মন্দভাগিনী—তত সুখে আমার কাজ নাই—আমার তত আশা নাই। কিন্তু রামচরণ, ধর্ম্ম মাথার উপর আছেন। একবার ভাবিয়া দেখ তুমি আমার কি দুর্দ্দশা না করিতেছ? আমি তোমার হৃদয়-রাজ্যে রাণী হইতে চাহি না। দিনান্তে তোমার চরণ একবার দেখিতে পাইলেই আমি সুখী হই। তুমি সে দেখা দেও কি? দেও না। তোমার মুখে দুইটা মিষ্ট কথা শুনিলে আমি কৃতার্থ হই। তুমি মিষ্ট কথা বলা দূরে থাক, কেবল ঘৃণা, তিরস্কার ও অপমানের কথা ছাড়া আর কিছু বল কি? বল না। রামচরণ, আমি মানুষ—ক্ষুদ্র মেয়ে মানুষ। আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণে আর কষ্ট সহে না। আমি তোমার পায়ে ধরি, রামচরণ, হয় আমাকে

বধ করিয়া সকল আমার শেষ করিয়া দেও, নয় প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেবতা, আমাকে সুখী কর, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর।"

এই বলিয়া কামিনী রামচরণের চরণ ধরিয়া বসিয়া পড়িল, এবং অবিরল ধারায় অশ্রু-বিসর্জন করিয়া তাহার চরণ সিক্ত করিতে লাগিল।

পাষাণ—ভীষণ পাষাণময় রামচরণের হৃদয় বিগলিত হইবার নহে। রামচরণ কামিনীর হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া লইল এবং বলিল,—

"কামিনি! তোমার অন্যায় কথা আমি কেমন করিয়া শুনি। আমি তোমাকে কোন্ বিষয়ে অসুখী করিয়াছি বল। আমি তোমাকে আনিয়াছি সত্য—কিন্তু তুমি না আসিলে তোমাকে ধরিয়া আনি নাই। তোমার খাওয়া পরার কোন কষ্ট নাই। গহনা প্রতিকার আমার যেমন ক্ষমতা তোমাকে দিয়াছি, তবে তোমার অসুখ কি? তুমি হাতি ঘোড়া চাহিলে আমি কেমন করিয়া দিব?"

"প্রাণনাথ! ছি, ছি গহনা প্রতিকাবের জন্য তোমার এ দাসী কাঁদিতেছে না। তাহা আমি চাহি না। খাওয়া পরা তাহাতেও আমার প্রয়োজন নাই। আমি উপবাস করিয়া থাকিতে হইলেও, কাতর হইব না। আমার ভিক্ষা কি? দাসী কেবল তোমাকে চাহে; এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কোন পদার্থে তাহার লোভ নাই। আর তুমি তাহাকে যাহা দিয়াছ, তাহা ফিরাইয়া লও, সে সকলের জন্য সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও ত্যাগ করিবে না। তাহার একমাত্র প্রার্থনা—তুমি তাহার হও।"

রামচরণ হাঃ হাঃ শব্দে হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল,—

"মন্দ নয়। এ সুখের সংসার, এ চাঁদের হাট-বাজার, আমি তোমার জন্য ছাড়িয়া দিই। আমি তোমাকে খাইতে দিই, পরিতে দিই —তুমি আমার হইয়া থাকিবে, আমার সুখের জন্য তুমি। তোমার

হুকুম মতে আমি চলিব, এ আশা তুমি ত্যাগ কর। এ সংসারে তোমার ন্যায় শত শত মেয়ে মানুষ গড়াগড়ি যাইতেছে। আমি কেবল তদগত চিত্তে তোমাকেই ধ্যান করিব, এমন আশা যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তবে তোমার ভুল হইয়াছে। যাহা হইবে না, যাহা হইবার নহে, তাহা ভাবিয়া যদি তুমি মনকে কাতর কর, সে দোষ আমার নহে।"

আবার কামিনী নীরবে সমস্ত কথা শুনিল। আবার ভাবিল, মানব হৃদয়ে এত কষ্টও সহে। বলিল,—

"তবে—রামচরণ—তবে কি আমাদের প্রাণের ভালবাসা নয়? তবে কি আমাদের ভালবাসা বেশ্যার প্রেম। তবে কি আমি, ডাক্তার বাবু, তোমার নিকট গহনার লোভে, খাওয়া পরার লোভে, সতীত্ব, ধর্ম্ম, কুল, মান বিক্রয় করিয়াছি? তবে তোমার উপর আমার অন্য দাবি দাওয়া কিছুই নাই কি? তবে, রামচরণ, তবে কি আমি তোমার বেশ্যা মাত্র?"

রামচরণ হাসিয়া বলিল,—

"কেমন করিয়া, কি বলিব বল? কে জানে, তুমি মনে মনে কত কি ভাব। এখন আমি চলিলাম। আমার দরকার আছে। আবার দেখা হইবে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রামচরণ ডাক্তার চলিয়া গেল। উত্তরের অপেক্ষা করিলেও উত্তর দিত কে? কামিনীর চৈতন্য তখন কামিনীতে নাই। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কামিনী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল, ঘরে আর কেহ নাই। তখন ঊর্দ্ধ-নেত্র হইয়া করজোড়ে কামিনী বলিল,—

"হে দয়াময়, হে পতিতপাবন, হে অনাথনাথ ভগবান্, এ ধর্ম্ম-হীনা, পতিতা, ভ্রষ্টার প্রার্থনা তুমি শুনিবে কি? হে বিশ্বাত্মঃ, এ জ্বালা আর সহে না। দয়াময়। দয়া করিয়া এ দুঃখিনীর জীবনের শেষ করিয়া দাও। মৃত্যু। আমাকে তোমার আশ্রয়ে লইয়া যাও।

রামচরণ—পাপিষ্ঠ নরাধম রামচরণ, আমি ক্ষুদ্র বেশ্যা? আমার প্রেম কেনাবেচার সামগ্রী? হৃদয়ের হৃদয় হইতে পবিত্র প্রেম আমি তোমাকে অকাতরে দান করিয়াছি। তুমি মূর্খ, তুমি শঠ, তুমি আমাকে বেশ্যা বলিয়া মনে কর। তোমার প্রদত্ত ভূষণ এই ত্যাগ করিলাম, তোমার বস্ত্র আর পরিধান করিব না, তোমার পাপ অন্ন ইহজীবনে আর উদরে দিব না। রামচরণ—প্রবঞ্চক জানিও, আর আমি তোমার প্রেমের ভিখারিণী নহি। আজ হইতে, রামচরণ—আজ হইতে এই পদ-বিদলিতা, ব্যথিতা কামিনী তোমার প্রবল শত্রু হইল। প্রতিজ্ঞা করিলাম, তোমার চক্ষে জল দেখিয়া, তোমাকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করাইয়া, তোমার পাপের সমুচিত শাস্তি দিয়া আমি ইহজগৎ হইতে প্রস্থান করিব।

মা ও মেয়ে।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন গড়াইতে গড়াইতে চলিল। দিনে দিনে মিলিয়া সপ্তাহ, সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিয়া মাস এবং মাসে মাসে মিলিয়া বৎসর চলিতে লাগিল। এক, দুই করিতে করিতে ক্রমে তিন বৎসর হইয়া গেল। পিতৃহীনা, দুঃখিনী, মরণাপন্না শরৎকুমারীকে আমরা সেই দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িত রুগ্ন-শয্যায় ফেলিয়া আসিয়াছি। পাঠক! একবার সেই নিরাশ্রয়া বালিকার সন্ধান লইতে আপনার মন ব্যাকুল হইতেছে না কি?

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে রূপনগরে দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবন-প্রাঙ্গণে একটী ভুবনমোহিনী বালিকা আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। বালিকার অবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি পৃষ্ঠাচ্ছাদন করিয়া ঘাসের উপর পড়িয়া লুটাইতেছে। বালিকার দেহ লাবণ্যে চল্ চল্ করিতেছে। উজ্জ্বল, আয়ত, প্রশান্ত লোচনদ্বয় স্থির ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বালিকা বাম হস্তে ভর দিয়া ঈষ-

স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বালিকার বয়স দ্বাদশ অতিক্রম করে প্রায়। অনেক ক্ষণ সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকার পর বালিকার নয়ন-যুগল যেন অশ্রুজল হইয়া উঠিল। বালিকা দীর্ঘ নিশ্বাস সহ 'মাগো' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া আর একবার আকাশের পানে চাহিল চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—

"একটী—দুইটী—তিনটী তারা ফুটিয়াছে। এখনই আরও কত ফুটিবে। শুনিয়াছি তারাতেও মানুষ থাকে। যাহারা এখানে মরিয়া যায়, তাহারা গিয়া কি তারায় মানুষ হইয়া বাস করে?—"

বালিকার কথা শেষ হইতে না হইতে এক বৃদ্ধা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"শরৎ! মা তুমি এখানে? একি মা, চক্ষু ভার কেন?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা শরতের লোচনদ্বয় অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিলেন। তখন শরৎকুমারী বৃদ্ধার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—

"না মা, আমি তো কাঁদি নাই।"

বৃদ্ধার বর্ণ সুগৌর—মূর্ত্তি ভক্তিজনক। তাঁহার হস্তদ্বয়ে শঙ্খভূষণ, সীমন্তে সুবিস্তৃত সিন্দুর-বিন্দু ও ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে এক উজ্জ্বল তিলক শোভা পাইতেছে। বৃদ্ধার পরিধানে মলিন বস্ত্র। নবীন পাঠিকারা যাহাই মনে করুন, আমি এই প্রাচীনার মূর্ত্তিকে ভক্তি-জনক বলিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ সেই সরলতা-পূর্ণা শান্তি স্বরূপার প্রবীণ অবয়ব যথার্থই ভক্তির উদ্রেক। এই প্রবীণা দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণী—করুণাময়ী।

করুণাময়ী শরৎকুমারীর আগুল্ফ-লম্বিত কেশরাশি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—

"চুলগুলা কি অমনি করিয়া বাধিতে হয়? এক গাছ দড়ি দিয়াও কি বাঁধিতে নাই? চুলগুলা নুড়ো নুড়ো হইয়াছে যে।"

শরৎকুমারী হাসিতে লাগিল,—কথায় কোন উত্তর দিল না। করুণাময়ী আবার বলিলেন,—

"খাওয়া দাওয়া মনে নাই। চল, ভাত খেতে হবে মা?"

শরৎ বলিল,—

"মা মা, আমি হয়ত আজি খাব না। শরীর কেমন কেমন বোধ হইতেছে।"

করুণাময়ী সোৎসুক ভাবে বলিলেন,—

"সে কি মা, শরীর খারাপ বোধ হইতেছে! দিনে বুঝি ঘুমিয়েছিলে?"

"না মা, দিনে তো ঘুমাই নাই।"

"চুল বুঝি ভাল করিয়া শুকাও নাই?"

"না মা, চুল তো বেশ করে শুকিয়েছিলাম।"

"তবে কি জানি কেন, শরীর আবার খারাপ হলো। চল এখান থেকে, আর হিম লাগিয়ে কাজ নাই।"

মা ও মেয়ে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

শরৎকুমারীকে আমরা সেই বিপন্ন দশায় দেখিয়াছিলাম। সে রাত্রি সেইরূপ ভাবেই কাটিয়া যায়। পরদিন প্রাতে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমারীর পীড়ার অবস্থা দেখিতে যান। তিনি মরণাপন্না শরৎকুমারী একাকিনী শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পান। তাঁহারই অপরিমেয় যত্নে ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িতা শরৎকুমারী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। কিন্তু সুলোচনা কোথায়? সে সংবাদ শরৎকুমারী জানে না, কেহই জানে না। দীননাথ চট্টোপাধ্যায় সাধ্যমত অনুসন্ধানে ত্রুটী করিলেন না, কিন্তু কোনই সন্ধান হইল না। কত লোক কত কথাই বলিতে লাগিল, সঙ্গত অসঙ্গত কতই অনুমান করিতে লাগিল। সকলই অনুমান মাত্র, কার্য্যতঃ কোন সন্ধানই হইল না। তখন দীননাথ চট্টোপাধ্যায় অগত্যা সে আশা ত্যাগ করিলেন। তাহার পর অনাথিনী, আশ্রয়হীনা, দারিদ্র-দুঃখ-নিপীড়িতা, ব্যাধিক্লিষ্টা শরৎকুমারীকে আপনার বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। নিঃসন্তান দীননাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ব্রাহ্মণী করুণাময়ী

পিতৃ মাতৃ হীনা শরৎকুমারীর পিতা মাতার স্বরূপ হইলেন। বস্তুতঃ জনক জননী সন্তানকে যেরূপ স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও শরৎকুমারীকে তাহাই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত হীন, সুতরাং শরৎকুমারীকে তাঁহারা অননুভূতপূর্ব্ব সুখ সম্বেষ্টিত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অপরিমিত আন্তরিক স্নেহ যদি দেবদুর্লভ সামগ্রী হয়, তাহা হইলে শরৎকুমারীর সে সুখের সীমা ছিল না।

পিতাকে শরৎকুমারী চক্ষের উপর মৃত্যুকবলিত হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং মনকে এক প্রকার বুঝাইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সেই স্নেহময়ী জননী, যিনি অনন্তকর্ম্মা হইয়া নিয়ত শরতের মস্তক সমীপে বসিয়া থাকিতেন, যিনি আপনি না খাইয়া শরৎকে খাওয়াইয়া সুখী হইতেন, যিনি শয়নে স্বপ্নে প্রতিনিয়ত শরতের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন—শরতের সে জননী আজ কোথায়? বালিকা শরৎকুমারী জননীর চিন্তা হইতে মনকে একবারও বিরত করিতে পারে নাই। তিন বৎসরের অধিক হইল সুলোচনার সন্ধান নাই। এই সুদীর্ঘ কালও শরৎকুমারীর চিত্তকে প্রশমিত করিতে সক্ষম হয় নাই, দীননাথ ও করুণাময়ীর চেষ্টাও সফল হয় নাই। বালিকা এখন সর্ব্বদা সেই চিন্তা করুক না করুক, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চমকিয়া উঠে এবং এক একবার দৌড়িয়া বাহিরে আইসে—মনে হয়, বুঝি মা কথা কহিতেছে, বুঝি মা আসিয়াছে। বালিকার আশা এক দিনও সফল হইল না।

ঘরখানি যাহার নিকট বন্ধক ছিল, সে তাহা বেচিয়া লইয়াছে। তথাপি শরৎকুমারী সেই স্থানটায় প্রায়ই যায়। তাহার মনে হয়, যদি মা ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে সেই স্থানেই আসিবেন। কিন্তু তাহাকে না দেখিতে পাইলে হয়ত আবার চলিয়া যাইবেন। বালিকার দুরাশা।

বালিকা শরৎকুমারী এক্ষণে যৌবন-রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।

শরীর ও মন ক্রমশই পরিণত হইয়া উঠিতেছে। প্রাবৃটকালে প্রবাহিণী যেরূপ প্রতিদিনই পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ শরৎকুমারীর শরীর যৌবন-সমাগম হেতু দিন দিন অধিকতর লাবণ্যযুক্ত ও বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে। সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গঠন ক্রমেই অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে।

দীননাথ চট্টোপাধ্যায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে শরৎকুমারীর বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। শরৎকুমারীকে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য, এমন সৎ স্বভাব, এমন বুদ্ধি, এমন কন্যারত্ন কেহ বিবাহ করিতে চাহে না? চাহে না, তাহার কারণ আছে। শরৎকুমারীর জননী নিরুদ্দেশ। সে সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলে। এমন অবস্থায় কোন্ সাহসী পুরুষ সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া এই দেব-দুর্লভ কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে? সুতরাং দীননাথ চট্টোপাধ্যায় বহু চেষ্টাতেও শরৎকুমারীর বিবাহার্থ পাত্র স্থির করিতে পারেন নাই। পিতৃ-মাতৃ-হীনা দুঃখিনী বালিকার জীবনে একমাত্র সুখের আশা আছে—সে আশা বিবাহ। হায়! অভাগিনী শরৎকুমারীর অদৃষ্টে সে সুখও কি ঘটিবে না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রেই শরৎকুমারীর একটু জ্বর হইল। একটুই হউক আর অনেকই হউক, দীননাথ ও করুণাময়ী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। প্রাতে উঠিয়াই তাঁহারা চিকিৎসার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী ধীরে ধীরে করুণাময়ীকে বলিল;—

"মা আমার অসুখ বেশী নয়। হয়ত আপনিই সারিয়া যাইবে। বাবাকে ব্যস্ত হইতে বারণ কর।"

এ স্থানে পাঠকগণকে বিদিত করা বিধেয় যে, পিতৃমাতৃহীনা শরৎ এক্ষণে পিতৃ মাতৃ স্থানীয় দীননাথকে পিতা এবং তাঁহার পত্নীকে মাতা বলিয়া ডাকে।

সেদিন কাটিয়া গেল বটে কিন্তু শরৎকুমারীর অসুখ আপনি সারিয়া গেল না। তখন দীননাথ এক জন চিকিৎসক ডাকাইয়া রীতিমত চিকিৎসা না করাইলে নয় বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু ডাকা যায় কাহাকে? এক রামচরণ ডাক্তার—তাহাকে তো কোন ক্রমেই ডাকা হইবে না। তবে আর আছে কে? বাজারহাট প্রভৃতি দূর স্থান হইতে চিকিৎসক আনাইলে চলে, কিন্তু অনেক অর্থের প্রয়োজন। সেরূপ সম্ভাবনা কৈ? দীননাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় করুণাময়ী আসিয়া বলিলেন,—

"তুমি যদি একটু কষ্ট করিতে পার তাহা হইলে এখনই ডাক্তার পাওয়া যায়।"

দীননাথ জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি একটু কেন, অনেক কষ্ট করিতে পারি, কিন্তু ডাক্তার কোথায়?—

করুণাময়ী বলিলেন,—

"ভুতোর মার সঙ্গে এখনই পথে দেখা হইয়াছিল। সে বলিল, তার বাপের বাড়ি আনন্দপুরের জমিদার হেমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের বেটা, কি ভাল নামটা বলিল? কলিকাতায় থেকে ভারি বিদ্বান হয়ে দেশে এসেছে। সে বড় মানুষের ছেলে, পয়সার তো ভাবনা নাই। কি কাঙ্গাল, কি বড় মানুষ সে সকলকে ঘর থেকে ঔষধ দিয়ে যত্ন করে চিকিৎসা কর্চ্চে। তার অনেক যশ শুনিলাম। তুমি সকল মত ছেড়ে দিয়ে তার কাছে যাও।"

দীননাথ অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন,—

"অসম্ভব নয়। হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় অতি মহাশয় ব্যক্তি। আমার ব্রহ্মোত্তর জমি লইয়া যখন জমিদারেরা গোল তুলিয়াছিল,

সেই সময় আমি একবার তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম; তিনি আমার পরিচয় লইয়া যেরূপ যত্নে আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং আমার জমি যেরূপ সহজে খালাস দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে অতি মহৎ লোক তাহার আর কথা নাই।

করুণাময়ী বলিল,—

"তবে তো তোমার জানা শুনাও আছে। তবে তুমি তাই যাও।

দীননাথ বলিলেন,—

"যাইব বটে—কিন্তু এতদূর বড়মানুষের ছেলে কষ্ট করিয়া আসিবে কি?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"তার যখন এমন দয়ার শরীর তখন আসিতেও পারে। ভাল, গিয়াই তো দেখ।"

দীননাথ বলিলেন,—

"আচ্ছা, তাই ভাল। তুমি আমার ভাত বাড়।"

দীননাথ আহারাদি সম্পন্ন করিয়া একটী জীর্ণ ছাতা ও একগাছি বংশ-যষ্টি হস্তে লইয়া, মাথায় একখানি গামছা দিয়া, এবং কোমরে একখানি চাদর বাঁধিয়া রূপনগর হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী আনন্দপুর গ্রাম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাত্রি ৭ টা—৭॥০ টার সময় দীননাথ বাটীতে ফিরিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি শরৎকুমারীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা, কেমন আছ?"

শরৎকুমারী বলিল,—

"আমি ভাল আছি বাবা।"

তাহার পর দীননাথ শরৎকুমারীর কপালে একবার হাত দিয়া এবং হাত রাখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—

"হাঁ, জ্বর এখন নাই। কি খাবে মা?"

শরৎ বলিল,—

"বাবা, খেতে কিছুই ইচ্ছা নাই।"

"তবেই তো রোগের শেষ আছে। একটু ঔষধ পেটে পড়া চাই।"

করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"যে জন্য গিয়াছিলে, তাহার কি হইল?"

দীননাথ বলিলেন,—

"সে কায সকল হইয়াছে। কালি বেলা ১০টার মধ্যে দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় শরৎকে দেখিতে আসিবেন। আহা! কি চমৎকার লোক। সার্থক লেখাপড়া শিখেছে। রূপে কার্ত্তিক, গুণেও আশ্চর্য্য! বয়স কি? বড় জোর ২২। ২৩। কথা যে মিষ্ট তা আর কি বল্‌বো? হমিয়বতী বলে এক রকম নূতন চিকিৎসা উঠেছে, দেবেন্দ্র বাবু তাই শিখেছে। কত লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া যে রোজ দেখে, কতজনকে ঔষধ দেব তার সংখ্যা নাই। যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"এমন বড়মানুষের ছেলে এতদূর হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিবেন, তা আমাদের তাঁকে একটু বসিতে দিবার জায়গাও নাই।"

দীননাথ বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন,—

"আমরা গরিব জানিয়াই তিনি আসিতেছেন। আমাদের কি সাধ্য তাঁকে সন্তুষ্ট করি।"

হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবার জন্য দীননাথ বাহিরে আসিলেন।

শরৎকুমারী করুণাময়ীকে বলিল,—

"কালি জমিদারের ছেলে আমাদের বাটীতে আসিবেন। তাঁহাকে বসাইবার আসনের জন্য তুমি ভাবিতেছ। আমি যে কাঁথা খানি তৈয়ার করিয়াছি, সেই খানি পাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিলে হয় না মা?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"সেত ভালই হয়। তারও যে খানিকটা বাকি আছে।"

"অতি সামান্য বাকী আছে, আমি রাত্রেই সেটুকু সারিয়া রাখিতেছি।"

"না মা, তাতে কাজ নাই। তোমার এই জ্বর। এর উপর আবার পরিশ্রম করিলে হয়ত অসুখ বাড়িবে।"

"আধ ঘণ্টায় হবে মা, কোন ক্ষতি হইবে না।"

"কি জানি? ভয় হয় পাছে অসুখ বাড়ে।"

"কোন ভয় নাই মা। তুমি বল, আমি তাহলে সেটুকু করে রাখি।"

"পার—কর।"

তাহার পর শরৎকুমারী উঠিয়া সিন্দুক হইতে সেই চমৎকার শিল্প কৌশল সংযুক্ত কাঁথা বাহির করিল। তাহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম সূচী-কার্য্য ছিল তদ্দৃষ্টে দূর হইতে সেখানি জামিয়ার প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ মূল্যের সামগ্রী বলিয়াই ভ্রম জন্মে। শরৎকুমারী সূচ সূতা প্রভৃতি লইয়া অবশিষ্ট কার্য্য সমাপনার্থ বসিল।

চট্টোপাধ্যায় ও গৃহিণী আহার সমাপনান্তে শয়ন করিলেন। শয়নকালে তাঁহারা শরৎকুমারীকে কাঁথা রাখিয়া শয়ন করিবার জন্য অনেক করিয়া বলিলেন। শরৎকুমারী, 'এই হইল, এখনই হইবে' প্রভৃতি বলিয়া শয়ন করিল না। বাকি কাজটুকু সারিতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। তখন শরৎকুমারীর মাথা ঝম ঝম করিতেছে, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শরৎকুমারী সেই অবস্থায় অবসন্নভাবে শয্যায় পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা ৮॥০ সময় দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনদ্বারে অনেক গোল। বলিষ্ঠ অত্যুচ্চ অশ্বারোহী এক যুবাপুরুষ ভবনদ্বারে উপস্থিত। যুবার পায়ে উজ্জ্বল বিলাতী জুতা ও শুভ্র মোজা, পরিধান অতি পরিষ্কার ধুতি, গায়ে হরিদ্রাবর্ণের চীনাকোট এবং কোমরে কুঞ্চিত চাদর বাঁধা। যুবার মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত ও সৌম্য, দেহ পরিণত ও বলিষ্ঠ, বদনমণ্ডল বিশেষ জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। সেই অশ্বারূঢ় যুবক বিশেষতঃ সেই অস্থির, উজ্জ্বলকায় অশ্ব দেখিবার নিমিত্ত তথায় অনেক বালক, যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি সমাগত হইয়াছে। বালকেরা যখন অশ্ব যে দিকে মুখ ফিরাইতেছে, যখন যে রূপে পুচ্ছান্দোলন করিতেছে, যখন যেরূপে ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত করিতেছে, তদ্গতচিত্তে তাহা দর্শন করিতেছে এবং অতিশয় আনন্দ ও কৌতূহল প্রকাশ করিতেছে। অনেকগুলি স্ত্রীলোক বৃক্ষান্তরাল হইতে অশ্ব ও অশ্বারোহী পুরুষকে দেখিতেছে এবং ফুস্ ফুস্ করিয়া নানারূপ বর্ণনা করিতেছে। ফলতঃ নরনারী সকলেই যেরূপ আগ্রহ সহকারে এই দৃশ্য দর্শন করিতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, এদৃশ্য তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়জনক।

একজন লোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়া দিল। তিনি বাহিরে আসিবামাত্র যুবা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং দীননাথের সমীপাগত হইয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে নমস্কার করিলেন। অশ্বরক্ষক অশ্ব লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। বালক বালিকা বহুদূরে থাকিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

দীননাথ যৎপরোনাস্তি সমাদর সহকারে যুবককে সঙ্গে লইয়া

ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার হেতু আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও কতকগুলি পল্লিবাসিনী স্ত্রীলোক ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। দীননাথ ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া বলিলেন,—

"ইনিই দরিদ্রপালক, প্রাতঃস্মরণীয় হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র—দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়। ধনে মানে কুলে শীলে ইঁহাদের সমান আর কে আছে? ব্রাহ্মণি, আজি আমাদের কুটীর পবিত্র হইল। ইনি অশেষ বিদ্যা শিখিয়া গরিবের উপকারের জন্য ডাক্তারিও করিতেছেন।"

দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিলেন। করুণাময়ী বলিলেন,—

"ভগবান তোমাকে চিরজীবি করুন। আমরা গরিব দুঃখী, আমাদের আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কি উপায় আছে?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আমাকে সন্তান বলিয়া মনে করিবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমার সকল মঙ্গলের হেতু।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, মহামাননীয়, সর্ব্বজন পরিচিত হেমেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্রের এতাদৃশ কোমল স্বভাব ও এতাদৃশ অচিন্তিতপূর্ব্ব ভদ্রতা দেখিয়া দুই একজন পল্লিবাসিনী স্ত্রীলোকের নয়নে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইল। কেহ কেহ বা মনে মনে, কেহ কেহ বা প্রকাশ্যে বলিল,—

"বাবা তুমি চিরজীবি হও, বাবা তুমি ক্রোড়পতি হও।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরৎকুমারী স্বর্ণকান্তি তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল। তিনি অবাক্ হইলেন। দরিদ্রের কুটীরে এমন স্বর্ণকমল কে আশা করে? দেবেন্দ্র বুঝি-

লেন এরূপ রূপরাশি আর কখন তাঁহার চক্ষুগোচর হয় নাই; তিনি আজি আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ইহাঁরই কি অসুখ হইয়াছে? কি অসুখ?"

দীননাথ অসুখের বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। তাহার পর করুণাময়ী বলিলেন,—

"বাবা, তুমি আজি আসিবে কিন্তু আমরা কাঙ্গাল মা; কোথায় তোমাকে বসিতে দিব বলিয়া ভাবিতেছিলাম। মেয়ে আমার ঐ কাঁথা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ওতে একটু কাজ বাকি ছিল। ওতেই তোমাকে বসিতে দিতে হইবে মনে করিয়া বাকি কাজটুকু শেষ করিয়া সারিয়া রাখিবার জন্য মেয়ে কালি রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়াছেন, তাহাতেই আজি অসুখ বেড়েছে।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"এই কাঁথা এঁর তয়েরি? এযে অতি চমৎকার সামগ্রী।"

শরতের বদন লজ্জাযুক্ত হইল। ধীরে ধীরে শরৎ নয়নদ্বয় মুদিলেন। দেবেন্দ্র বুঝিলেন যে পীড়িতা কেবল ভুবনমোহিনী সুন্দরী নহেন,—তিনি অসাধারণ শিল্পনিপুণা।

তাহার পর বলিলেন,—

"রাত্রি জাগিয়া অন্যায় করিয়াছেন। আমার জন্য এরূপ কষ্ট করিয়াছেন বলিয়া আমি আরও দুঃখিত হইতেছি; আমার জন্যই আজি তবে উহাঁর অসুখ বাড়িয়াছে।"

শরৎ আরও লজ্জিতা হইলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"হাত দেখি।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘড়ি খুলিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া হাত দেখিলেন, তাহার পর জিহ্বা, তাহার পর চক্ষু ইত্যাদি নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন এবং নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর সমভিব্যাহারী একজন লোককে ঔষধের বাক্স আনিবার নিমিত্ত

বলিয়া পাঠাইলেন। একজন লোক একখানি সুপরিষ্কৃত তোয়ালে বাঁধা একটী সুন্দর বাক্স আনিয়া দিল। বাক্সের উপর দুইখানি বড় বড় ইংরাজি পুস্তক এবং ৪।৫ খানি ছোট ছোট বাঙ্গালা পুস্তক ছিল। দেবেন্দ্র বাক্স খুলিয়া বলিলেন,—

"যে ঔষধ দিতেছি তাহা খাইতে কোন কষ্ট নাই। আজি নিয়মমত ঔষধ খাইলে, কালি আর কোন অসুখ থাকিবে না।"

দীননাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ কি ডাক্তারি ঔষধ বাবু?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আজ্ঞা হাঁ, এ ডাক্তারি ঔষধ বটে। ইহার নাম হোমিওপেথি। এ চিকিৎসা বড় নির্ব্বিঘ্ন, অথচ বড় উপকারী। আপনারা যদি শিখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি এর বাঙ্গালা পুস্তক দিতে পারি। তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন এবং চিকিৎসাও অনেক শিখিতে পারিবেন।"

দীননাথ বলিলেন,—

"আমি আর বুড়া বয়সে কি শিখিব বাবু? শরত মা, তুমি তো দিন রাত্রি পড, তুমি এ বই পড়িবে কি?"

ব্রীড়া-নম্র-বদনা শরৎকুমারী চুপ করিয়া রহিলেন।

দেবেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন,—

"উনি পড়িতে জানেন?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"জানেন বই কি? কত রামায়ণের কথা, কত মহাভারতের কথা, কত মেঘনাদের কথা, মা কত কথাই আমাদের বই পড়িয়া শুনাইয়া দেন। বই নিয়ে আর সূচ নিয়ে মা দিনরাত্রি ব্যস্ত। ওঁর প্রায় এক সিন্দুক বই।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"তবে উনিই পড়িবেন। এ বিদ্যা ওঁরই শিক্ষা করা আবশ্যক।"

এই বলিয়া দুইখানি পুস্তক দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার পর রোগীর পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন এবং বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—

"হয়ত কালি একবার আসিব।"

তাহার পর শরতের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"আজি যেন আবার শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিও না। অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন পড়িও না। কাঁথা শেলাই করিতে হয়, ভাল হইয়া করিও। আমি এখন আসি।"

শরৎ লজ্জা সহকৃত ঈষদ্ধাস্য সহ বদন বিনত করিলেন।

ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়া দেবেন্দ্র বাহিরে আসিলেন। দীননাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এবং সন্নিহিত ব্যক্তি সকলের প্রতি প্রীতি পূর্ণ হাস্যসহ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেবেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিলেন।

দীননাথ কৃতজ্ঞতা সূচক দুই একটা কথা বলিবেন মনস্থ ছিল, কিন্তু তাহা বলিবার আর সময় হইল না। দেবেন্দ্রনারায়ণের অশ্ব সবেগে ছুটিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন,—অদ্য তাঁহার সুপ্রভাত, অদ্য তিনি যে বালিকা দেখিলেন, তিনি রমণীরত্ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রায় সেই সময়েই দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় শরৎকুমারীকে দেখিবার নিমিত্ত রূপনগরে দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে আগমন করিলেন। তিনি দেখিলেন শরৎকুমারী ভালই আছেন। অন্নাহার ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পর দেবেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"চিকিৎসার পুস্তক কিছু পড়িয়াছিলে কি ?"

শরৎকুমারী সলজ্জ ভাবে বলিলেন,—

"একটু একটু পড়িয়াছি।"

দেবেন্দ্র। হোমিওপ্যাথি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

শরৎকুমারী বলিল,—

"বোধ হয় কিছু পারিয়াছি।"

তাহার পর দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"বিষয়টা বড় শক্ত। যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহা আমাকে বলিলে আমি বলিয়া দিতে চেষ্টা করি।"

দীননাথ বলিলেন,—

"তুমি যাহা বুঝিয়াছ, বাবুকে বল। যদি কোন জায়গায় ভুল থাকে বাবু বলিয়া দিবেন এখন।"

শরৎকুমারী লজ্জায় বদনাবনত করিলেন। করুণাময়ী বলিলেন,—

"তাহাতে দোষ কি মা ? বল না কেন ?"

শরৎকুমারী ধীরে ধীরে অতি অল্প কথায়, সেই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে যতদূর বুঝা যায় তাহা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ বিস্ময় মনে করিলেন। তিনি কখনই এত দূর প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি শরৎকুমারীকে আরও এক খানি হোমিওপেথিক পুস্তক প্রদান করিলেন ও সময়ে সময়ে ভাল ভাল পুস্তক পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন এবং তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর হাসিতে হাসিতে শরৎকুমারী ও করুণাময়ীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত হয়ত কত শত বার সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আপনাদের সহিত হয়ত আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আপনারা আমাকে আপনার লোক বলিয়া জানিবেন এবং যখন আমাকে কোনরূপ আবশ্যক পড়িবে, তাহা বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না।"

করুণাময়ী তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শরৎকুমারীর বদন বিমর্ষ হইয়া গেল।

দেবেন্দ্রনারায়ণ বাহিরে আসিলেন। দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেবেন্দ্র দীননাথকে 'শরৎ কে এবং তাহার বৃত্তান্ত কি' সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দীন-নাথ তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ জানাইলেন এবং যে কারণে এখন পর্য্যন্ত শরতের বিবাহ হয় নাই তাহাও জানাইলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু শরৎকুমারীর মাতার ভালরূপ সন্ধান হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি একবার এ সম্বন্ধে সন্ধান করিব। আপনি সে সময়ে এ কথা আমার পিতা ঠাকুরকে জানাইলে, বোধ হয়, বিশেষ উপকার হইত। যাহা হউক, আমি অদ্যই গিয়া তাহাকে এ কথা জানাইব, বোধ করি, তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ ভাবিতে ভাবিতে অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, যে ব্যক্তি শরৎকুমারীর স্বামী হইবে, এ জগতে সেই ভাগ্যবান্।

সেই দিন প্রদোষকালে শরৎকুমারী ঘাসের উপর বসিয়া রহি-য়াছে। আজি কিন্তু তাহার দৃষ্টি আকাশে নাই, আজি তাহার চিত্ত তারা-গণনায় নিযুক্ত নহে। আজি তাহার মনে স্বতন্ত্র প্রকার চিন্তা-প্রবাহ দেখা দিয়াছে। সে চিন্তার নাম কি তাহা সে জানে না, কেন মনের এ ভাব হইল তাহা সে বুঝে না, এ ভাব কিসের অঙ্কুর তাহাও সে জানে না, তথাপি তাহার চিত্ত-ক্ষেত্র আজি অভিনব চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত। এ চিন্তার পরিণাম সুখ কি দুঃখময় বালিকা তাহা এক একবার ভাবিতেছে, আবার তখনই সে ভাবনা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতেছে। বালিকা ভাবিতেছে,—'মানুষ তো সকলেই, কিন্তু দেবেন্দ্রনারায়ণ আশ্চর্য্য মানুষ। এত দয়া, এত পরোপকার প্রবৃত্তি, এমন বিনয়, এত শিষ্টাচার, এত পাণ্ডিত্য, এক সঙ্গে আর

কাহার আছে? দেবেন্দ্রনারায়ণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। তিনি মনুষ্যের মধ্যে দেবতা।"

বলা বাহুল্য যে, শরৎকুমারী দেবেন্দ্রনারায়ণের গুণের বিশেষ পক্ষপাতিনী হইয়াছে।

বালিকা আবার ভাবিতেছে,—'যাহারা সর্ব্বদা এই দেবতার কাছে বাস করিতে পায় তাহারাই সুখী। যাহারা দেবেন্দ্রকে আমাদের বলিতে পায় তাহাদের কি অতুল আনন্দ। তাহারা জীবনে স্বর্গসুখ অনুভব করে।"

বলা বাহুল্য যে শরৎকুমারী দেবেন্দ্রনারায়ণের নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়াছেন।

বালিকা আবার ভাবিতেছে,—"তাহার সহিত ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না। হায়! আমার রোগ এত শীঘ্র সারিল কেন? রোগ না সারিলে প্রতিদিনই তো তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সুস্থ থাকার অপেক্ষা তাঁহাকে নিত্য দেখিতে দেখিতে চিরদিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকাও ভাল। চেষ্টা করিয়াও তো রোগ করা যায়। আমি তাহাই করিব।"

বলা বাহুল্য যে, শরৎকুমারী দেবেন্দ্রনারায়ণকে অজ্ঞাতসারে স্বীয় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন।

এই সকল ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে চিন্তা-তরঙ্গ ক্রমশঃ রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। শরতের মনে হইল,—

"মা যদি থাকিতেন, তবে আজি তাঁহার এই দেবেন্দ্রনারায়ণকে দেখিয়া, না জানি, কত সুখই হইত। বাবার মৃত্যুর পর এমন লোক আর আমরা দেখি নাই। হায়! আজি মা কোথায়? আজি মা এই দেবতার কতই বর্ণনা করিতেন, আমি তাঁহার মুখে দেবেন্দ্রের কতই সুখ্যাতি শুনিয়া কতই পুলকিত হইতাম, আবার মার যদি বা কোন কথা বলিতে ভুল হইত, আমি তাহা বলিয়া দিতাম। মাগো! বাবার মৃত্যুর পর, তোমার অন্তর্ধানের পর, তোমার এ অভাগিনী কন্যা

আর একদিনও আজিকার মত আনন্দ পায় নাই। এ সময়ে মা আমার কোথায় রহিলে? তুমি আইস মা, আমি আজি তোমার গলা জড়াইয়া মুখে মুখে রাখিয়া দেবেন্দ্রনাথগণের কথা বলি।"

দুঃখিনী বালিকা অঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সপ্তাহ অতীত হইল। বেলা প্রায় তিনটা। দীননাথ বাটী নাই, খাজনা আদায় করিতে গিয়াছেন। করুণাময়ী রান্নাঘরের মধ্যে অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া আছেন। ঘরের ভিতর দুইটী সুন্দরী বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। সুন্দরীদ্বয়ের একজন শরৎকুমারী, অপরা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা, কল্যাণপুরের সুরূপা বৈষ্ণবীর কন্যা সোহাগী। সোহাগী কতকগুলি বঙ্গসাহিত্যের উৎকৃষ্ট পুস্তক লইয়া আসিয়াছে। পুস্তকগুলি অতি উত্তম কাগজে জড়ান এবং তাহার উপর রেসমী ফিতা দিয়া বাঁধা। সকল পুস্তকের উপরই লাল কালিতে অতি পরিষ্কার অক্ষরে লিখিত,—

"শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে উপহার স্বরূপে প্রদত্ত হইল।"

শরৎকুমারী বলিলেন,—

"আমি কি বলিয়া কি বলিব? আমাকে যে তাঁহার মনে আছে, ইহা আমার নিতান্ত সৌভাগ্য। আর কি বলিলে ভাল হয়, তাহা আমি জানি না। তুমি ভাই, ভাল করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিও।"

সোহাগিনী বলিল,—

"আমি কেমন করিয়া বলিব? আমার সঙ্গে তো তাঁর দেখা হবে না।"

"তবে তোমাকে বই দিল কে?"

"আমার স্বামী তাঁহার কাছারীতে কাজ করেন। তিনি স্বামীকে বড় ভালবাসেন, বিশ্বাসও করেন। আমাদের বাড়ী কল্যাণপুর। স্বামীকে তিনি এই বই গুলি দিয়া বলিয়া দেন যে, কোন বিশ্বাসী মেয়েমানুষের হাত দিয়া এগুলি তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এবং তুমি কেমন আছ সে খবরও বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। স্বামী পাছে অপর কোন লোকের দ্বারা ঠিক্ বাবুর মনের মত কাজ না হয়, এই ভয়ে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

শরৎ সোহাগীর হাত ধরিয়া বলিলেন,

"তবে তো ভাই, তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছ!"

সোহাগ বলিল,--

"তোমার জন্য ভাবিয়া তো করি নাই। বাবুর কাজ আমার স্বামীর করিতেই হইবে, আর স্বামীর করিতে হইলে কাজেই আমারও করিতেই হইবে। ইহাতে আমার বেশী কিছুই করা হয় নাই।"

"আমার খবর তুমি জানিয়া গেলে। কিন্তু যে দেবেন্দ্র বাবু আমাদের মত কাঙ্গাল দুঃখী লোকদের এত দয়া করেন, যিনি আমাদের এত অনুগ্রহ করেন, তাঁহার কোন খবর তো আমি জানিতে পারিলাম না। তুমি তো সেখানে কখন যাও না।"

সোহাগ বলিল,--

"কেন যাইব না? আমি প্রায়ই তাদের বাড়ী যাই, সেখানে খাই দাই, থাকি। তাছাড়া আমার স্বামীর মুখে তাঁহাদের খবর রোজ পাই। তুমি বাবুর কথা কি জানিতে চাও, বল। আমি সব খবর দিতে পারি।"

তখন শরৎকুমারী একে একে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল। তিনি কেমন করিয়া লোকজনের সঙ্গে কথা কহেন, তাঁহার স্বভাব কেমন, তাঁহার দয়া কেমন, তিনি কেমন করিয়া খান, কতক্ষণ পড়েন, সমস্ত দিন কি কি করেন, তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি কেমন, ইত্যাদি নানা কথাই শরৎকুমারী জিজ্ঞাসা করিল এবং সোহাগী তাহার যে

যে উত্তর দিতে লাগিল, তাহা নিজের মনের মত হওয়াতে দেবেন্দ্রর প্রতি দেবতা বলিয়া যে ভক্তি ছিল, সেই ভক্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং ভক্ত যেরূপ ভাবে হরি-গুণ-গাথা শ্রবণ করে শরৎ সোহাগীর কথা সকল তদ্রূপ ভাবে শ্রবণ করিতে লাগিল।

রাধারমণ সোহাগীকে বলিযাছিল যে, "বাবু মেযেটীকে বড় ভালবাসেন বোধ হয়।" সোহাগী বুঝিল,—"ছুঁড়ীটা বাবুকে বড় ভাল-বাসে—নিশ্চয়।"

তাহার পর সোহাগী বলিল,—

"তবে এখন আমি আসি।"

শরৎ বলিল,—

"তা হবে না ভাই,—দেবেন্দ্র বাবুর এত দযার কথা মা শুনিযা কি বলেন, তাহা না শুনিয়া তোমার যাওয়া হবে না। দাঁড়াও মাকে ডাকি।"

এই বলিযা শরৎকুমারী করুণাময়ীকে ডাকিযা আনিযা, সমস্ত কথা বলিল এবং অতি আহ্লাদ ও গৌরব সহকারে একে একে তাঁহাকে পুস্তকগুলি দেখাইল। করুণাময়ী সমস্ত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিযা বলিলেন,—

"আমরা কঙ্গাল। আমাদের যে তিনি এত দযা করেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমারা তাঁহারই আশ্রিত।"

সোহাগী করুণাময়ীকে প্রণাম করিযা বিদায় চাহিল। করুণাময়ী বলিলেন,—

"তা কি হয়? তোমার একটু জল খাইয়া যাইতে হইবে। আমরা গরিব, আমাদের ঘরে তো আর কিছু নাই। চারিটী চালভাজা আর একটু গুড় আছে, তাই খেয়ে একটু জল খাও।"

সোহাগ বলিল,—

"মা ঠাকুরাণি আমি আপনার দাসী। দাসীকে যা ইচ্ছা হয় দেন।"

সোহাগের জলখাওয়া হইলে সে বিদায় হইল। তাহাকে বিদায় দিবার নিমিত্ত শরৎকুমারী ও করুণাময়ী ভবনদ্বার পর্য্যন্ত আসি-লেন। সোহাগ দৃষ্টির সীমা ছাড়াইয়া গেলে, শরৎ ভাবিলেন, "দেবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে যে কুমারীর বিবাহ হইবে, সে না জানি কত যুগ যুগ কত তপস্যাই করিয়াছে।" তাঁহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বামমতি নাম্নী এক অর্দ্ধ-বয়সী প্রতিবেশিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তোমাদের বাড়ী থেকে ও মেয়ে মানুষটা চলিয়া গেল, ও কে গা?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"ওর বাড়ী কল্যাণপুর, ও বৈষ্ণবদের মেয়ে।"

"ওমা! এতদূর থেকে একলা তোমাদের বাড়ী কেন এসেছিল? কই আর তো কখন ওকে দেখি নাই।"

"না, আর কখন ও আসে নাই। একটু দরকারের জন্য আজি এসেছিল।"

"কল্যাণপুরে বৈষ্ণবদের যে পুরাণ জ্বরের ঔষধ আছে, তাই বুঝি শরতের জন্য ওকে দিয়ে আনাইলে?"

"না, তা নয়। ও একজন লোকের কাছ থেকে এসেছিল।"

"কার কাছ থেকে? কই, কল্যাণপুরে তোমাদের জানা শুনা কেহই নাই তো।"

"না, কল্যাণপুরের কোন লোকের কাছে থেকে আসে নাই।"

"তবে কোথাকার লোক? যার কাছে থেকেই হউক, কোন অমঙ্গল না হলেই হলো মা। আমাদের এই কথা।"

তাহার পর যেন নিজে নিজে বলিতে লাগিল,—

"ওদিকে তোমাদের কে আছে? হবে কেহ আছে। আমরা কি সব জানি? আনন্দপুর—আনন্দপুর থেকে তো ও আসে নাই গা?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"হাঁ—তাই বটে।"

"হাঁ—হাঁ রাজা বাবুর কাছে থেকে বুঝি? কিছু দিয়েছে কি গা? আহা হউক হউক। আমাদের কি, আমরা শুনিলেই সুখী। কি দিয়েছে? ছটাকা দশটাকা হবে কি? তা হবে বৈ কি। তার যে দয়ার শরীর—বাপের কত টাকা। দেবতা ব্রাহ্মণে তাদের বড় ভক্তি। যেমন করে হউক ছটাকা পেলেই হলো মা।"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"না, টাকা কড়ি কিছু দেয় নাই।"

"তবে জিনিষ পত্র বুঝি? তা তাই হউক, যেমন করে হউক ছটাকার উপকার তো হবেই সংসার ছদিন সচ্ছল তো হবেই।"

"সে রকম কোন জিনিষ নয়। শরৎ বড় পড়িতে ভাল বাসে, তাই তাকে খান কতক বই দিয়েছে।"

রামমতি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিল,—

"শরতকে বই দিয়াছে, তা দিক। শরতকে বড় ভাল বাসে বুঝি? তা আর বাস্‌বে না? বই দিয়েছে—হয়ত তার ভেতর আরও কত কি আছে। তা দেখ গে মা। আহা হউক। আমি যাই।"

এই বলিয়া রামমতি একটু বক্র হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। মা ও মেয়ে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সোহাগ খানিকটা দূর যাইতে না যাইতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষতল হইতে একটী পুরুষ মানুষ আসিয়া তাহার নিকটস্থ হইল এবং বলিল,—

"এত দেরি যে?"

সোহাগ বলিল,—

"যাহার প্রতি বাবুর এত টান, বাবুর চাকরের বারমেসে মুনিষ তাহার কাছে গিয়াই চলিয়া আসিতে পারে কি?"

যে পুরুষকে সোহাগী এ কথা বলিল বলা বাহুল্য যে, সে ব্যক্তি রাধারমণ। রাধারমণ বলিল,—

"তুমি আমার বাইবাজা। যাক্রা যাউক। এখন দেখিলে কি?"

"দেখিব কি ? দেখিলাম জীবন্ত সরস্বতী।"

"বটে ? তাইতে। বাবুর যেন একটু বিশেষ অনুরাগ বলে বোধ হয়, এদিকে কি রকম দেখিলে ?"

সোহাগী বলিল,—

"তোমার বাবুর কি তাহা জানি না, কিন্তু এদিকে অগাধ ভালবাসা।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে স্বামী ও স্ত্রী পথ চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় দুই দিন শরৎকুমারীর চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন এবং সোহাগী একদিন কয়েকখানি পুস্তক লইয়া দীননাথের বাটীতে আসিয়াছিল, এই মূল বৃত্তান্ত ক্রমশঃ রূপনগরের লোকের মুখে মুখে ভয়ানক রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা হইয়াছে যে, শরৎকুমারী ও দেবেন্দ্রনারায়ণের অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে। দীননাথ ও করুণাময়ী তাহা জানেন ও তাহার উৎসাহ দিয়া থাকেন। লোক সুও আছে, কুও আছে। সু লোকেরা প্রথম প্রথম এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল যে, 'শরৎকুমারী নিতান্ত বালিকা।' কিন্তু কু লোকেরা এক কথায় ইহার খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে যে, 'এগার বৎসর বয়সে এখন লোকের ছেলে হয়, সুতরাং শরৎকুমারীর ছেলের মা হইবার বয়স হইয়াছে।' সুলোকেরা আরও বলিয়াছিল যে, 'দেবেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক।' তাহার উত্তরে কুলোকেরা বলিয়াছিল, 'একে বড় মানুষের ছেলে, তাহাতে বয়স কাল। একপ দোষ ঘটিলে সেটা তার পক্ষে বড়

নিন্দার কথা নহে, তাহাতে তাহার চরিত্রেরও দোষ হয় না।' কাজেই কুলোকদিগের জয় হইল। তাহার পর এই ভয়ানক কথা নানারূপে পল্লবিত হইতে লাগিল। সুলোকের কেহ কেহ বলিল, 'দোষ তো ঘটিবারই কথা, এত বড় মেয়ে কখনই আইবুড় রাখা সাজে?' কুলোকের কেহ কেহ বলিল,—'এত জানা কথা। যার ঐ কীর্ত্তি—মেয়ে তার নাম রাখিবে না? আইবুড় না রেখে হবে কি? কে ঐ কীর্ত্তিধ্বজা আপনার ঘরে লইবে?' কেহ কেহ বলিল,— 'মেয়ে মানুষকে লেখাপড়া শিখাইলেই এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। এ অপবাদের প্রমাণও অনেক পাওয়া গেল। একজন বলিল,— 'দেবেন্দ্র বাবু যে শরৎকুমারীকে পত্র লেখে এবং শরৎকুমারীও যে দেবেন্দ্র বাবুকে পত্র লেখে তাহা আমার খুড়ীর মামাত ভগ্নী বেশ জানে।' আর একজন সাক্ষ্য দিল,—'একদিন দেবেন্দ্র বাবুর একজন লোক এক তোড়া টাকা লইয়া দীননাথের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমাদের মেজোবৌর মাসতুতো ভাই স্বচক্ষে দেখিয়াছে।' আর একজন বলিল,—'শরৎকুমারীর গলায় একদিন এক ছড়া আশ্চর্য্য, প্রায় দু হাজার টাকা দামের মুক্তার মালা হবের মা ভাল করিয়া দেখিয়াছে।' একজন বলিল,—'গত অমাবস্যার দিন ঘোর অন্ধকার রাত্রে আমাদের নসিরাম দেখিয়াছে, একজন লোক দীননাথের বাটী হইতে বাহির হইল। লোকটার হাতে হাতির দাঁতের ছড়ী, গলায় সোণার হার, পায়ে বার্নিস করা জুতা। লোকটার কাছে নসিরাম যাইতে না যাইতে লোকটা আম গাছের আড়ালে ষোলটা বেহারার এক পাল্কি ছিল, তাহাতে উঠিয়াই আনন্দপুরের দিকে চলিয়া গেল।' অতএব এত অকাট্য প্রমাণ থাকিতে গ্রামের লোকেরা কেমন করিয়া একথা অবিশ্বাস করিবে? কেহই অবিশ্বাস করিল না। সুলোকও ক্রমে কুলোক হইয়া পড়িল। কথা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ দীননাথের কর্ণে এই নিদারুণ কথা আসিয়া পৌঁছিল। তিনি

অবাক্ হইলেন। সত্যই বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। লোকগুলা এখন বৃদ্ধকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমাদের রামচরণ বাবু দীননাথ চট্টোপাধ্যায়কে একঘরে করিবার প্রধান উদ্যোগী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার রাগের প্রধান কারণ (১) দীননাথ শরতের পীড়ার সময় তাঁহাকে ডাকে নাই। (২) হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার প্রবল শত্রু। সেই হেমেন্দ্রনারায়ণের পুত্র দীননাথের প্রধান সহায়। অতএব দীননাথকে অপমান করিতে পারিলে প্রকারান্তরে হেমেন্দ্রনারায়ণকেও অপমান করা হয়। দলাদলির ঘোঁট পাকিতে লাগিল। নিরপরাধ, পরদুঃখকাতর দীননাথ নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

রাত্র নয়টা কি দশটা হইবে। দীননাথ ফুস্ ফুস্ করিয়া করুণাময়ীকে কি কথা বলিতেছেন। শরৎকুমারী শুইয়াছিল। দীননাথ মনে করিয়াছিলেন, শরৎ ঘুমাইয়াছে। শরতের ঘুম আইসে নাই। দীননাথের অস্ফুট কথার মধ্য হইতেও শরৎকুমারী দুই একবার নিজের নাম শুনিতে পাইল। তাহার বাবা তাহার কথা কি বলিতেছেন, শুনিবার জন্য তাহার বড়ই আগ্রহ হইল। সে মনোযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল কথা শুনিতে লাগিল। দীননাথ বলিতেছেন,—

"এখন উপায় কি?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"উপায় আর কি? লোকে একটা মিথ্যা কথা লইয়া আমাদিগকে এমন করিয়া কখনই কষ্ট দিতে পারিবে না। ধর্ম্ম তো আছেন।"

দীননাথ বলিলেন,—

"আরে কথা যে মিথ্যা সে তো তুমি বলিলে আর আমি বলিলাম, লোকে তো তা বলে না।"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"লোকে অমনি বলিলেই হইবে? লোকে জানুক, শুনুক, দেখুক। কোন দোষ পায় তখন বলুক, আমাদের যে সাজা দিতে চায় দিউক—আমরা ঘাড় পেতে নেব।"

দীননাথ বলিলেন,—

"তাতো বটেই। দুদিন দেবেন্দ্র বাবু আমাদের বাড়ী এসেছিলেন, শরৎ পড়িতে ভাল বাসে বলে, মেয়ে মানুষের হাত দিয়ে একদিন তিনি কয়েকখান বই শরতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই তো মোট কথা। কিন্তু লোকে কত কথাই বলিতেছে—লোকে বলিতেছে, দেবেন্দ্র বাবু আমাদের কত টাকা দিয়েছে, শরৎকে কত গহনা দিয়েছে, প্রায়ই রাতে আমাদের বাটীতে আসে—আর মাথা মুণ্ডু কি আর বলিব?"

করুণাময়ী বলিলেন,—

"এমন অন্যায় করিয়া কষ্ট দিয়া, লোকের যদি সুখ হয় হউক। ভগবান্ আছেন, ইহার বিচার তিনিই করিবেন। [illegible] গরিব, আমরা নিঃসহায়। কিন্তু তাহা বলিয়া লোকে [illegible] যে ভগবানের বিচারেও পার পাইবে, তা কখনও মনেও ভেবো না।"

দীননাথ বলিলেন,—

"হা ভগবান্, বৃদ্ধকালে আমাকে কি বিপদেই ফেলিলে? নিজের ছেলে নাই, পিলে নাই, একটা পরের মেয়ে লইয়া শেষটা কত কষ্টই পাইতে হইল। জীবনটা দুঃখেই কাটিল। যাহা হউক, দুঃখে কষ্টে শাকান্ন খাইয়া দিন কাটাইতে ছিলাম। নিরাশ্রয়া পরের মেয়েকে আনিয়া আশ্রয় দিলাম। ভাল কাজই করিলাম। তাহার কি এই পুরস্কার? শরৎকুমারী যে আমার একমাত্র আদরের ধন—আজি তাহারই জন্য আমার এই লাঞ্ছনা। আজি সে যদি আমার ঘরে না থাকিত, তাহা হইলে তো কোন কথাই হইত না। যদি যথাসময়ে তাহার বিবাহ হইত, তাহা হইলেও তো কোন গোল উঠিত না। হায়! এখন করি কি?"

সমাজ-ভীত, ধর্ম্ম-ভীত, নিরীহ ব্রাহ্মণ আপনাকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে বসিয়া নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারা কত কথাই বলিতে লাগিলেন, কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর নিতান্ত ক্লান্ত ও হতাশ ভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরল হৃদয়া শরৎকুমারী কাষ্ঠ পুত্তলীর ন্যায় ভাবে সমস্ত কথা শুনিল। তাহার মালিন্য-বিরহিত পবিত্র হৃদয়ে পাপ কি, তাহার জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। তাহার সম্বন্ধে যে যে অপরাধ ঘোষিত হইতেছে, সে তাহার কিছুই জানে না—সে তাহার কিছুই বুঝে না। যে কর্ম্ম সে কখন করে নাই, যে দোষে তাহার কোন সংস্রব নাই এবং যে কার্য্য হেতু তাহার সরল হৃদয় একবারও সঙ্কুচিত বা কাতর হয় নাই, সেরূপ কোন কার্য্যের জন্য যদি লোক মন্দ কথা কহে, তবে যাহারা সেরূপ নিন্দাবাদ করে তাহারাই প্রকৃত দোষী। সুতরাং সেরূপ কারণে শরৎকুমারীর মনে কোন প্রকার রাগের সঞ্চার হইল না, বিশেষ দুঃখ হইল না। ভাবিল, 'লোকে যদি বলে অমুকের অনেক জিনিষ চুরি গিয়াছে, অথচ সে যদি দেখে, তাহার কোন জিনিষই লোকসান হয় নাই, যাহা যেমন তাহা ঠিক তেমনই আছে তাহা হইলে, সে যেমন লোকের কথা শুনিয়া দুঃখিত হয় না, তেমনি আমি যখন দেখিতেছি, লোকে যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা তখন আমার দুঃখিত, কাতর বা লজ্জিত হইবার কোনই কারণ নাই তো।' কিন্তু বালিকার মনে অন্য কারণে বিষম কষ্ট উপস্থিত

হইল। সংসার-বোধ-বিহীনা বালিকা সে চিন্তায়, সে কষ্টে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার জন্য আজি তাহার একমাত্র আশ্রয়, পরম-স্নেহনিকেতন, পিতা-মাতার স্থলাভিষিক্ত এবং প্রতিপালক দীননাথ ও করুণাময়ী যার পর নাই কষ্ট পাইতেছেন, এ চিন্তা তাহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিতে লাগিল। বালিকা কাঁদিতে লাগিল। ভাবিল, এ অভাগিনীর জীবন কেবল অনন্ত ক্লেশ আচ্ছন্ন। কোথায় পিতা—আজি কোথায় মাতা। কোথায় গৃহ কোথায় অন্ন বস্ত্র। দুঃখিনীর ইহজগতে কিছুই নাই। পরের আশ্রয়ে, পরের অন্নে, পরের স্নেহে, পরের অনুগ্রহে বাঁচিয়া আছি। কিন্তু কি পরিতাপ, আজি সেই অকপট আত্মীয়ও এ দুঃখিনীর জন্য বিপদাপন্ন। আজি আমিই তাহাদের যাবতীয় ক্লেশের, যাবতীয় মনস্তাপের এবং যাবতীয় দুশ্চিন্তার কারণ। এ অভাগিনী যে দিক দিয়া যাইবে সেই দিকেই কি বিপদ, চিন্তা, হাহাকার, রোদন প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে যাইবে? একপ জীবন লইয়া এ সংসারে কেমন করিয়া থাকিব?

বালিকা এইরূপে পিতার কথা, মাতার কথা মাতার দেশব্যাপী কলঙ্কের কথা, দীননাথ ভট্টাচার্য্যের কথা একে একে সকলই ভাবিল। ক্রমে তাহার মনে হইল,—'আমি কে? আমার জন ইঁহারা এত কষ্ট কেন সহ্য করিবেন? আমি যদি না থাকি, তাহা হইলে, এ সকল বিপদ কিছুই ঘটিবে না। যত দায়, যত বিপদ, যত চিন্তা সকলই আমার জন্য। আমি যদি না থাকি, তাহা হইলে সে সকলও থাকিবে না। তবে আমার অভাবে উঁহাদের বড় কষ্ট হইবে বটে। কিন্তু বর্ত্তমান কষ্টের চেয়ে সে কষ্ট ভাল, কারণ তাহাতে লজ্জা নাই, অপমান নাই, ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব আমার এখানে না থাকাই সৎপরামর্শ। আমি এখানে আর থাকিব না।

থাকিব না,—যাইব কোথায়, করিব কি, খাইব কি, ইত্যাদি

কোন চিন্তাই বালিকার মনে আসিল না। বালিকা স্থির করিল,—'এখানে থাকিয়া ইহাঁদের কষ্ট দিব না। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, আমি আজি রাত্রেই এখান হইতে চলিয়া যাইব—এখানে আর থাকিব না।'

তখন বালিকা কেমন করিয়া এই পিতৃমাতৃবৎ আত্মীয় জনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব ভাবিয়া অধোবদনে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা হৃদয়কে অনেকটা দৃঢ়, অনেকটা সহিষ্ণু করিয়া লইল। গাত্রোত্থান করিয়া শবৎ হাত যোড় করিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া মনে মনে বলিল,—

"পিতামাতা, অভাগিনী অনেক দিন হারাইয়াছে। কিন্তু আপনাদের অনুকম্পায় পিতা মাতার অভাব আমি জানিতে পারি নাই। আজি আপনাদের কাছ-ছাড়া হইতেছি, আজি আমি যথার্থই পিতৃমাতৃহীনা হইলাম। আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেও পারিলাম না। দেখা করিলে আমাকে আপনারা ছাড়িবেন না তো। কিন্তু আপনাদের এ বৃদ্ধ বয়সে, এ ধর্ম্মচিন্তার সময়ে, আমি আপনাদের সর্ব্বপ্রকারে ব্যাঘাত করিব না। অতএব বাবা, মা, আজি তোমাদের শবৎ বিদায় হইল। আমি তোমাদেরই দাসী। তোমরা দাসীকে আশীর্ব্বাদ করিও।'

চক্ষের জলে বালিকার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে ঘরের দ্বার খুলিল—বাহিরে আসিল। তখন আবার বলিল,—

"এই অসীম সংসারে অসংখ্য মানুষ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষীর যে উপায়, আমারও সেই উপায়। যিনি সকলকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন।"

বালিকা আবার একবার গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিল। আবার মনকে বুঝাইয়া বাহিরে আসিল।

তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। বসুন্ধরা নিস্তব্ধ। রজনী

যেন ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারের গাঢ়তা যেন কমিয়া গিয়াছে। শ্বেতবসনা উষা-সতীর পিঙ্গলবর্ণা অগ্রদূতী যেন দেখা দেয় দেয় হইয়াছে। শরৎকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে, অদৃষ্টে কি হইবে, মানবের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, পদে পদে কতই বিপদ বালিকা তাহার কিছুই জানে না। সুতরাং যে দিকে পথ দেখিল সেই দিকেই অগ্রসর হইল।

বালিকে শরৎকুমারি! চারি বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আজি আবার বলিতেছি, 'এ সুখের সংসারে দুঃখের ভাগই অধিক। এই দুঃখরাশি ভেদ করিয়া দৈবাৎ সময়ে সময়ে কণিকামাত্র সুখ আসিয়া দেখা দেয়। সেই অত্যল্প সুখ তখন সকল বিগত ক্লেশ বিগত যাতনা ভুলাইয়া দেয় এবং সংসারকে পরম সুখের স্থান বলিয়া প্রতীত করে।' বৎসে! অধীর হইও না—ব্যস্ত হইও না। যদি এ সুখের সংসার সম্ভোগে সাধ থাকে তবে সহিষ্ণুতা সহকারে সুস্থির হইয়া অপেক্ষা কর। অবশ্যই একদিন সুখ তোমার আয়ত্ত হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় দুপরাতি। বড় রৌদ্র, সূর্য্যদেব যেন অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন। বসুন্ধরা যেন তাপে তাপিত হইয়া কাঁপিতেছে। পক্ষটী পর্য্যন্ত ডাকিতেছে না। কেবল এক একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া চাপা গলায় অস্ফুট স্বরে এক একবার ডাকিতেছে। কোন জীবই আহারাদি স্বাভাবিক কার্য্যের চেষ্টাও করিতেছে না। সকলেই অলস, শিথিল ও নিশ্চেষ্টভাবে বাছিয়া বাছিয়া শীতল স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া আতপ-তাপ হইতে শরীর রক্ষা করিতেছে।

রূপনগরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটী জনহীন প্রান্তর মধ্যে

চারিদিকে বাঁশ, অশ্বত্থ, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষ-সমাবৃত ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণী-তীরে বৃক্ষছায়ায় শরৎকুমারী বসিয়া কাঁদিতেছে। কোমলাঙ্গী বালিকার পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছে, দেহ যৎপরোনাস্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুৎপিপাসাও নিতান্ত কাতর করিয়াছে। বালিকা শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত এই শীতল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখানে আসিয়াই তৃষ্ণা দূর করিবার নিমিত্ত অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া প্রথমতঃ পেট ভরিয়া জল খাইয়াছে। পথে লোকের সঙ্গে শরৎকুমারীর প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। যে দুই এক জন লোকের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারা প্রায়ই হয়ত তাহার প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, কেহ কেহ বা দুই একটা কদর্য্য পরীহাস বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছে। বালিকা লোকের ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে এবং ভাবিয়াছে, এ জগতে যদি সকলেই দেবেন্দ্র নারায়ণ হইত তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হইত।

বালিকা বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া কাঁদিতেছে। কাঁদিতেছে কেন?. বালিকা ভাবিতেছে,—'কি করিলাম, এ কোথায় আসিলাম, এখন কোথায় বা যাইব? কত পথই আসিয়াছি। ফিরিয়া যাইব? না না, আর ফিরিব না, না জানি বাবা মা কতই কাঁদিতেছেন কতই খুঁজিতেছেন। আমি ফিরিয়া গেলে তাঁহাদের কতই আনন্দ হইবে। কিন্তু আমি থাকিলে তাহাদের কষ্টও অনেক বাড়িবে। তাঁহারা সমাজে স্থান পাইবেন না, আমার জন্য তাহাদিগকে পাপীর ন্যায় ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইবে, আমার জন্য তাহাদিগকে লোকের কত কথাই সহিতে হইবে, আর আমার জন্য তাহাদের কষ্টের—উদ্বেগের সীমা থাকিবে না। তবে ফিরিব কেন? ফিরিয়া কাজ নাই। কিন্তু এখন যাই কোথা—করি কি?'

আবার বালিকা অনেকক্ষণ অনেক কথা আলোচনা করিল। তাহার পর ভাবিল, 'এই পুষ্করিণীর জলে যদি ডুবি, তাহাতে ক্ষতি

কি? আমি মরিলে এ জগতের লাভ বই লোকসান নাই। আমি কাহারও কখন কোন কাজে লাগিব এমন বোধ হয় না। স্বয়ং কেবল দুঃখই ভোগ করিতেছি, আত্মীয় জনকেও কেবল দুঃখই দিতেছি। সম্মুখেও তো কোন সুখের চিহ্ন দেখিতেছি না। তবে এ জীবন নাই রাখিলাম। মৃত্যুর সুযোগও তো বেশ উপস্থিত।'

বালিকা যখন এই রূপ ভাবনা ভাবিতেছে তখন তাহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাদিক হইতে দুইটী লোক সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। লোক দুইটীর পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাদিগকে ইতর, অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়াই বোধ হয়। আগন্তুকদ্বয়ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া শান্তিদূর করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল। তাহারা এরূপ স্থলে একটী যুবতী বসিয়া আছে দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্ময়াবিষ্ট, পরে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শরৎকুমারীর নিকটস্থ হইল। শরৎকুমারী তাহাদিগকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। আগন্তুকদ্বয়ের একজন বলিল,—

"ভয় নাই—ভয় নাই—চমকাও কেন? আমরা মানুষ-খাব না।"

শরৎকুমারী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। পুরুষও দেখিল যে, তাহাদের সম্মুখস্থা কিশোরী সুন্দরীর শিরোমণি। তাহারা আরও বুঝিল যে, সুন্দরীর নেত্রদ্বয় এখনি অশ্রুত্যাগ করিতেছিল। একজন বলিল,—

"তুমি কাঁদিতেছিলে? তোমার এই বয়স, এত রূপ—তোমার কিসের দুঃখ? তুমি একটু হাসিয়া চাহিলে, দুটা কথা কহিলে কত লোক কৃতার্থ হইয়া যায়। তোমার চক্ষে জল?"

শরৎকুমারী কি বলিবেন? তিনি বুঝিলেন, এখানে আর থাকা ভাল নয়। ভাবিলেন,—"হায় এ দারুণ রৌদ্রের সময় এই শীতল স্থানটায় বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম, ভগবান তাহাতেও বাদী। অভাগিনীর কপালে কি কোন প্রকারে সুখ নাই?

দীর্ঘনিশ্বাস সহ শরৎকুমারী গাত্রোত্থান করিলেন এবং অবনত মস্তকে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তখন আগন্তুকদ্বয়ের একজন গিয়া তাহার সম্মুখে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—

“সে কি? যাও কোথা? আলাপ পরিচয় হইল, দুদণ্ড এখানে থাক, চাঁদমুখে দুই একটা কথা কও—আমোদ আহ্লাদ কর—তার পর যদি নিতান্তই যেতে হয় বলিও, যেখানে যাবে, আমরা মাথায় করে পৌঁছে দিয়ে আসিব।”

আগন্তুকদ্বয়ের একজনই প্রথম হইতে কথা কহিতেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক্ষণে বক্তার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল এবং বলিল,—

“ছিঃ কি, ছিঃ! কাজ কি? ও বড় রসিক মেয়ে মানুষ ওকে যেতে দাও।”

শরৎকুমারী পথ পাইয়া দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। লোকটা সঙ্গীকে বলিল,—

‘এও কি কথা? হাতে পেয়ে ছাড়তে আছে? তোমার মত আহাম্মক দুনিয়ায় আর নাই। ছেড়ে দেও—ধরে আনি।”

শরৎকুমারী পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, লোকটা সঙ্গীর হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছে। শরৎকুমারী দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। লোকটা শরৎকুমারীকে দৌড়াইতে দেখিয়া সঙ্গীর হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত বড়ই জোর করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীও তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত করিতে লাগিল এবং সাবধানতা সহকারে ধরিয়া রাখিল। অনেকক্ষণ গোলমালের পর লোকটা সঙ্গীর হাত ছাড়াইয়া বেগে ছুটিতে লাগিল। শরৎকুমারী তখন প্রাণপণে দৌড়িতেছে। পার্শ্বে বা পশ্চাতে কোন দিকেই শরৎকুমারীর দৃষ্টি নাই। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন। ঘোর পরিশ্রম, এতাবৎকাল অনাহার, প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ প্রভৃতি কারণে শরৎকুমারী নিতান্ত কাতর ছিলেন। কিন্তু এখন বিপন্না বালিকার আর সে সকল

রক্ষা নাই—বালিকা তীরের ন্যায় ছুটিতেছে। কিন্তু সকল কষ্টই বুঝি বৃথা হয়, লোকটা নিকটস্থ হয় হয় [illegible] পশ্চাতে তাহার পদ-ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। ভা[illegible] নাই চিন্তিবার অবসর নাই। দৌড়িয়া পলাইয়া [illegible] এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। বালিকা কেবলই দৌড়িতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষাদির ধারে গিয়া একটা অত্যুচ্চ শ্বেতবর্ণ [illegible]র অংশ বিশেষ শরৎকুমারীর চক্ষে পড়িল। সেইখানে আশ্রয় পাওয়া যাইবে ভাবিয়া শরৎকুমারী সেই দিক পানে ফিরিলেন। শরৎকুমারী প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে একটা অতি মনোহর এক তলা ভবনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বেগে সেই ভবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর 'মাগো, আমায় রক্ষা কর' বলিয়া [illegible] পড়িয়া গেলেন। সেই ভবন দ্বারের উভয় পার্শ্বে আট দশ জন পালোয়ান, [illegible]টা দ্বারবান বসিয়া, কেহ বা থালায় কবিয়া রুটির ময়দা মাখিতেছিল, কেহ বা নলিচায় চিমটা বাঁধা লম্বা পিত্তলের হুঁকায় নল লাগাইয়া তামাকু খাইতেছিল, কেহবা ঘরে 'লেজিস্টার' জন্ম লম্বা লম্বা রেখা টানিয়া ঘটী বাটীর অনুরূপ অক্ষর যুক্ত 'খৎ' লিখিতেছিল, কেহ বা সেই লেখকের পার্শ্বে বসিয়া তাহার অসাধারণ ক্ষমতার প্রশংসা করিতেছিল, কেহ বা পাথরের বাটীতে নীমের সোটা দিয়া '[illegible]ঙ্গ' ঘুঁটিতেছিল, কেহ বা আলকাতরা-মাখান, গায়ে কাগজের ছাপ-লাগান আম-কাঠের সিন্দুকের মধ্যে আপনার প্রিয় পাত্র রেখাইয়া রাখিতেছিল, কেহ কেহ বা দেয়াল হেলান দিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া ছিল। সকল দ্বারবানই একসঙ্গে 'ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া' শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ লাঠি হস্তে বাহিরে ছুটিয়া আসিল কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। অনুসরণকারী যখন দেখিল শরৎকুমারীর গতি এই দিকে ফিরিল, তখনই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং একটু কি ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপরীত দিকে পলায়ন করিল। সুতরাং দ্বারবানেরা দেখিল, পথে তো কিছুই নাই। দ্বারবানেরা বুঝিল শরৎকুমারী

মূর্চ্ছিতা। তাহারা নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল, অথচ কি করা আবশ্যক অথবা কে কি করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

"কি হইয়াছে? গোল কিসের? ব্যাপার কি?"

উপরের বারান্দা হইতে একজন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন দ্বারবান তাহাকে সসম্ভ্রমে বৃত্তান্তটা জানাইল। তখনই সেই প্রশ্নকারী ব্যস্ততা সহ নামিয়া আসিলেন। দ্বারবানেরা বিশেষ সম্মান সহকারে সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি শীঘ্র করিয়া একজন দ্বারবানকে শীতল জল আনিতে এবং আর একজনকে পাখার বাতাস করিতে আদেশ করিলেন। জল আসিলে ধীরে ধীরে তিনি শরৎকুমারীর মুখে, চক্ষে, কপালে, ঘাড়ে শীতল জল দিতে লাগিলেন এবং দ্বারবান অত্যধিক জোরে বাতাস করিতেছে দেখিয়া, তাহার নিকট হইতে পাখা লইয়া স্বয়ং এক হস্তে বাতাস এবং অপর হস্তে জল প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বহুযত্নে, অনেকক্ষণ পরে শরৎকুমারীর চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, তিনি মনে মনে যাহাকে মানবের মধ্যে দেবতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন সেই দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় অতি যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

মা ও মেয়ে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কামিনী শুইয়া আছে। কামিনীর সে অপূর্ব্ব রূপ-শশধর যেন বিষাদ-মেঘাচ্ছাদিত হইয়া মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সে চমৎকার উজ্জ্বলতা যেন নষ্ট হইয়াছে, তাহার সে টলটলায়মান পূর্ণতা যেন শুষ্ক হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ কামিনীর দেহ প্রকাশ করিতেছে যে, তাহার মনে সুখ নাই—সে যেন বড় দাগা পাইয়াছে। কামিনী দাগা পাইয়াছে বটে। তাহার বড় সাধে ছাই পড়িয়াছে। রামচরণ তাহাকে যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, ক্লেশের উপর ক্লেশ দিয়া, হতাদরের উপর হতাদর করিয়া নিতান্ত জ্বালাতন করিয়াছেন। যে সুখের লোভে, যে প্রেমের আশায় সে জানিয়া শুনিয়া আপনার অধঃপতন আপনি ঘটাইয়াছে, আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে এবং ধর্ম্মের সুখ ছাড়িয়া অধর্ম্মের নরকে ডুবিয়াছে, সে সুখ, সে প্রেম কিছুই সে পায় নাই—তাহার সাধের স্বপ্ন এখন ভাঙ্গিয়াছে। সমাজে তাহার এখন স্থান

নাই, ধর্ম্মে তাহার এখন অধিকার নাই, স্বর্গ-সুখ তাহার এখন কল্পনার অতীত, সংক্ষেপতঃ সে এখন পতিতা, ভ্রষ্টা, কালামুখী! মানুষের যাহা যাহা সুখ, যাহা আশা তাহার সে সকল এখন কিছুই নাই। এ সকলই সে জানিতেছে, এ সকলই সে বুঝিতেছে সুতরাং তাহার ন্যায় দুঃখিনী আর কে আছে? এমন যাহার চিন্তা এবং এমন যাহার বোধ, তাহার দেহের শোভা, যৌবনের শ্রী কেমন করিয়া থাকিবে? কামিনীর দেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, এ কামিনী সে কামিনী নহে।

রামচরণের সহিত কামিনীর আরও দুই একবার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু কামিনীর যাহা অভিলাষ তাহা কি সফল হইয়াছিল? না—না। রামচরণ পাপ জানে, পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মই সে করিতে জানে। সে কেবল জানে না কোন প্রকার কোমলতা। সুতরাং যে তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার কোমলতা ভিক্ষা করে, তাহার বিডম্বনা।

কামিনী গৃহ মধ্যস্থ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছে। কামিনীর পরিধান বস্ত্র মলিন, কেশরাশি অবিন্যস্ত, দেহ ভূষণ-শূন্য। শুইয়া শুইয়া কামিনী বাম পদটী দুলাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ঘরের এক কোণে মিট্ মিট করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে।

বাহির হইতে শব্দ হইল,—

"দরজা খোল।"

কামিনী বুঝিল রামচরণ ডাক্তার আসিয়াছে। একবার ভাবিল, 'দরজা খুলিব না।' আবার ভাবিল, 'তাহাতে লাভ কি?' ধীরে ধীরে উঠিয়া কামিনী দরজা খুলিয়া দিল। রামচরণ ডাক্তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিলেন—স্থির পদে নহে। তাহার অবস্থা ভাল নহে—পা টলিতেছে। তিনি আসিয়া ধপাস্ করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন,—

"কামিনি! তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, তাই ভাই, তোমায় দেখ্‌তে এসেছি।"

কামিনীকে না দেখিলে রামচরণের কোন করিয়া প্রাণ জ্বলে, তিনি তাহাকে কত ভাল বাসেন তাহা সকলই কামিনী জানে, সুতরাং তাহার এ আদর ভাল লাগিল না। সে কোন উত্তর দিল না।

রামচরণ আবার বলিলেন,—

"আমি মর্‌তে মর্‌তে তোমার কাছে ছুটে এলেম, তুমি একটী কথাও কহিলে না। ছিঃ কামিনি! আমি কি এতই ছোট লোক?"

কামিনী বলিল,—

"কথা আর কি বলিব? এলে ভালই—আমার সৌভাগ্য।"

কথাটা নিতান্ত ভাসা ভাসা, নিতান্ত না বলিলে নয় মত হইল। সুতরাং রামচরণের মনের মত হইল না। রামচরণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"তুমি চটেছ? বেশ করেছ! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইও। আসিয়াছি তাহা ভাগ্য করিয়া মানা নাই, আবার রাগ! তোমার রাগ নিয়ে তুমি ধুয়ে খাও।"

কামিনী বলিল,—

"আমার আবার রাগ কি? রামচরণ! আমি অনাথিনী, দুঃখিনী, কষ্ট সহিতে আমার জন্ম। আমি যথেষ্ট কষ্ট সহিতে পারি। রাগ কি আমাদের মত লোকের শোভা পায়? তুমি দয়া করিয়া আসায় যে বিশেষ কোন লাভ হইয়াছে এ কথা যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ভুল হইয়াছে। তোমার ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাও, ইচ্ছা হয় বসিয়া থাক, কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি দুঃখিনী। আমার এত সহিয়াছে—তুমি ত্যজিয়া চলিয়া যাইবে, সে কষ্ট টুকু আর সহিবে না?"

রামচরণ বিরক্ত ভাব আর এক মাত্রা বাড়িয়া গেল। বলিল,—"ভাবিয়াছ কি কামিনি, তুমি ছাড়া আর মেয়ে মানুষ নাই? তোমার বড় অহঙ্কার বাড়িয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে, তাহা তুমি স্থির জানিও।"

কামিনী বলিল,-

"কাহার দাসীপনা?—সরকারদের দরুণ কেনা বাড়ীতে তোমার যে নূতন রাণী আসিয়াছেন, তাঁহারই না কি?"

রামচরণ চমকিয়া উঠিল। থতমত খাইয়া বলিল,—

"সরকারদের দরুণ কেনা বাড়ী কি? কে আসিয়াছে? আমার নূতন রাণী কি? সে বাড়ীতে কেহ নাই তো। সেখানে কে আছে, তুমি কেমন করিয়া দেখিলে, তোমাকে বলিতে হইবে।"

উত্তরের জন্য রামচরণ অপেক্ষা করিল না। এখন রাগে তাহার শরীর কাঁপিতেছে। সে বলিল,—

"তোমার বড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। আমার যাহা খুসি আমি তাহাই করিব। আমার কাজে কথা কহে এমন ক্ষমতা কাহার? জানিও তোমার অনেক দুর্গতি আছে, আমার হাতে তোমার অনেক শাস্তি আছে।"

হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া কামিনী বলিল,—

"শাস্তি? আবার কি শাস্তি রামচরণ? আমি যে শাস্তি ভোগ করিয়াছি ইহার চেয়েও কি আর শাস্তি আছে? আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে রামচরণ? তোমার কাজে আমার কথা কহিতে ক্ষমতা নাই বটে, কিন্তু দেশ আছে, ধর্ম্ম আছে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি তোমার সর্ব্বনাশ অতি নিকট।"

এখন কামিনী জানিত, সরকারদের দরুণ বাড়ীটা রামচরণ ডাক্তার ক্রয় করিয়াছে। রামচরণ তাহা কিনিয়াছে বটে, কিন্তু কখন তাহা ব্যবহার করে না। সর্ব্বদা তাহাতে চাবি বন্ধ থাকে। এ কথাও কামিনী জানিত যে, প্রায়ই প্রতিদিন রামচরণ

একবার করিযা সেই বাটীতে যাব। এজন্য কামিনী মনে করিয়াছিল যে, ঐ বাটীতে একটা কি কাণ্ড কারখানা আছে। সে সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রামচরণের নিকট তাহার উল্লেখ করিল। রামচরণের প্রথমতঃ ভয়, তাহার পর ক্রোধ এবং তাহার কথাবার্ত্তার ভাব দেখিযা কামিনী বুঝিল, বস্তুতঃই তবে ঐ বাটীতে একটা কি কাণ্ড কারখানা আছে বটে। এদিকে রামচরণ প্রথমতঃ ঐ বাটীর উল্লেখ, দ্বিতীয়তঃ রাণীর উল্লেখ, তৃতীয়তঃ সর্ব্বনাশের উল্লেখ শুনিযা মনে করিল, এ তিনেরই মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে এবং কামিনী তাহা জানে। অতএব কামিনীর নিকট হইতে সে কথা আদায় করিতেই হইবে। এই ভাবিযা বলিল,—

"কি আমার সর্ব্বনাশ? কাহার সাধ্য এ কথা বলে? কামিনি, যদি ভাল চাও, তবে বল কিসে আমার সর্ব্বনাশ হইবে— কে আমার সর্ব্বনাশ করিবে? যদি না বল তবে জানিও তোমার সর্ব্বনাশ আমার হাতে।"

কামিনী বলিল,—

"আমার সর্ব্বনাশ তুমি যতদূর করিবার তাহা তো করিয়াছ, বাকি তো কিছুই নাই কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশের এখনও অনেক বাকি। তার আর দেরি নাই। এই কামিনীর হাতেই তোমার সর্ব্বনাশের ষোল কলা পূর্ণ হইবে।"

তখন রামচরণ,

"কি এত বড় সাহস, আমারই অন্ন খাইযা আমারই বিপক্ষে চক্রান্ত।"

এই বলিযা কামিনীর বক্ষে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল। কামিনী দূরে গিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পরদিন প্রত্যুষে কামিনী ঘরের দেয়াল ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে। সমস্ত রাত্রি কামিনী ঘুমায় নাই। কামিনীর চক্ষু রক্তবর্ণ, কামিনীর মূর্ত্তি ভয়ানক। তাহার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি চারিদিক দিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে ঝুলিতেছে, তাহার ললাটে সতেজ শিরা দেখা যাইতেছে, তাহার দৃষ্টিতে স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন প্রকটিত রহিয়াছে। কামিনী আজি অসাধ্য সাধন সংকল্প করিয়াছে, সে আজি বিষম চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করিয়াছে। রামচরণের অসহ্য উৎপীড়নে কাতর হইয়া কামিনী প্রথমতঃ আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার শেষ করিব বলিয়া স্থির করে। কিন্তু তাহাতে হইল কি? রামচরণ—দুরাচার, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নরপ্রেত রামচরণের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সে যে কামিনীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে—কামিনীর ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট করিয়াছে, কামিনীর সকল সুখের সকল আশার পথে কাঁটা দিয়াছে, কামিনীকে মর্ম্মান্তিক জ্বালা দিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়াছে তাহার শাস্তি কৈ? কামিনী মরিলে তাহার শাস্তি কি হইল? কামিনী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া মরিতে চাহে না—পারে না। প্রতিহিংসা—সকল জ্বালার শেষ সকল অপমান, সকল মনস্তাপের অবসান না করিয়া কামিনী আত্মহত্যা করিতে অসমর্থ। কামিনী এইরূপ আলোচনা করিয়া এখন আত্মহত্যার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছে। এক্ষণে তাহার একমাত্র বাসনা—রামচরণের পাপের অনুরূপ দণ্ডবিধান, তাহার পর মৃত্যু।

এখন কামিনী ভাবিতেছে—'বাসনা সিদ্ধির উপায় কি?' কিন্তু উপায় কিছুই কামিনীর ভাল বলিয়া মনে লাগিল না। তাহার পর ভাবিল,—'সরকারদের দরুণ কেনা বাড়ী—সেখানে নিশ্চয়ই রাম-

চরণের কোন গুপ্ত লীলা আছে। তাহার অনুসন্ধান করিলে, হয়ত আমার বাসনা-সিদ্ধির কোন উপায় হইতে পারে। দেখাই কেন যাউক না।"

কামিনী যখন এইরূপ আলোচনা করিতেছে, সেই সময় কাশিতে কাশিতে, বাহির হইতে কণ্ঠধ্বনি করিতে করিতে, একজন লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কামিনী তাহাকে দেখিয়া মুখের চুল সরাইল এবং বাহ্য-ভাব অপেক্ষাকৃত সহজ করিতে সচেষ্ট হইল। লোকটী আসিয়াই কাপড়ের কোণ হইতে কয়েকটী টাকা ও পয়সা বাহির করিয়া কামিনীর নিকট রাখিয়া দিল এবং বলিল,—

"টাকা দশটী এবং সুদ পাঁচ আনা দিতে আসিয়াছিলাম।"

তাহার পর লোকটী প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

তখন কামিনী বলিল,—

"রাধারমণ—যাইও না, দুটা কথা আছে।"

লোকটী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রাধারমণ। কামিনীর কয়েকটী টাকা ছিল, সে তাহা সুদে খাটাইত। রাধারমণ মধ্যে ঘর মেরামত করিবার সময় অপ্রতুল হওয়ায় কামিনীর নিকট হইতে দশটী টাকা ধার লইয়াছিল। আজ রাধারমণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছে। কামিনী তাহাকে কি কথা বলিবে, কেন যাইতে বারণ করিল, তাহা ভাবিয়া রাধারমণ স্থির করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে রাধারমণ দাবার এক প্রান্তে বসিল। তখন কামিনী বলিল,—

"রামচরণ ডাক্তার তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, তুমি সেই ভাল মানুষ তাই সহ্য করিয়াছিলে।"

রাধারমণ বলিল,—

"মানুষ মানুষের কি করিতে পারে মা? ভগবানই সকল কাজের বিচারক।"

কামিনী বলিল,—

"মানুষ কি না পারে রাধারমণ? মনে করিলে মানুষ সবই

পারে। ভগবান দুর্ব্বলের বল। রামচরণ আমার সর্ব্বনাশ করিযাছে, পাপে মজাইয়া আমার মাথা খাইযাছে, এখন আমি তাহার গলগ্রহ হইযাছি। রামচরণ সোহাগীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কতই চলাচলি না করিযাছে—আর রামচরণ যে কত পাপ, কত দুষ্কর্ম্ম করিযাছে, তাহা তোমায কি বলিব? তুমি কি মনে কর, রামচরণের এ সকল পাপের শাস্তি মানুষে দিতে পারে না—দিবে না। হেমেন্দ্রনারাযণ রায রামচরণকে একটু সাজা দিযাছেন—একটু মাত্র। অবশ্যই কোন না কোন দিন, কোন না কোন লোকের হাতে রামচরণ বিশেষ সাজা পাইবে। তাহার দিন ঘনাইযা আসিতেছে।"

তখন রাধারমণ বলিল,—

"ডাক্তার বাবু যে মহাপাপী তাহার ভুল নাই। পাপের ফল আছেই আছে মা।"

তাহার পর রাধারমণ যে কারণে যেরূপে রূপনগরে গিযাছিল, সোহাগের মুখে শরৎকুমারীর যে বৃত্তান্ত সে জানিতে পারিযাছে, উমাচরণ বন্দোপাধ্যাযের মৃত্যু, শরতের পীড়া, সুলোচনার নিরুদ্দেশ ইত্যাদি বৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণনা করিযা বলিল,—

"মা বলিব কি, কেহ কেহ বলে সুলোচনা যে নিরুদ্দেশ সেও হযত ডাক্তার বাবুর একটা লীলাখেলা।"

তখন কামিনী অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিযা বলিল,—

"এই গ্রামে সরকারদের কেনা বাড়ীতে ডাক্তারের নিশ্চযই বিশেষ গোপনীয় কোন কাণ্ড আছে। তুমি যে গল্প বলিলে, হযত তাহার সহিত আর ঐ গোপনীয ব্যাপারের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। রাধারমণ, আমি স্ত্রীলোক, আমি একলা কি করিতে পারি? তুমি যদি আমার সহায হও, তুমি যদি আমাকে পরামর্শ দেও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সরকারদের বাটীর লুকান কাণ্ডের খবর লইতে পারি, আর হযত তাহা হইতে তোমার—গল্পের পর পর ঘটনাও প্রকাশ হইতে পারে। কে জানে, রামচরণের পেটে

কত কীর্ত্তি আছে। রাধারমণ, তুমি আমাকে সাহায্য করিতে স্বীকার কর।"

রাধারমণ অনেকক্ষণ নানা চিন্তা করিল। সে ভাবিল 'দোষ কি? যাহাই হউক, ইহাতে কোন না কোন, কাহার না কাহার উপকার হইতে পারে—ভালই তো? আর কামিনী যেমন বলিতেছে যদি এই সন্ধানে সুলোচনার দৈবাৎ কোনও সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে তো পরম লাভ। প্রথম লাভ শরৎকুমারীর দুঃখ দূর হইবে, দ্বিতীয় লাভ—রাজাবাবু (দেবেন্দ্রনারায়ণ) শরৎকুমারীর ভাবনা বিশেষ ভাবেন। যদি আমার দ্বারা এ সন্ধান হয়, তাহা হইলে, আমার উপর তাহার বিশেষ অনুগ্রহ হইবে, তৃতীয় লাভ—ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, চতুর্থ লাভ—রামচরণ জব্দ হইবে।'

কামিনী রাধারমণের সহানুভূতি উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রথম হইতে অনুরোধ করিতেছিল। এক্ষণে ক্রমশঃ রাধারমণের মনে সহানুভূতি ও উদ্দেশের একতা ঘটাইবার নিমিত্ত স্বার্থ, ধর্ম্ম, ইত্যাদি কারণও আসিয়া জুটিল। কার্য্যতঃ উভয়ের লক্ষ্য ক্রমশঃ এক হইয়া পড়িল।

তখন রাধারমণ বলিল,—

"আমি সামান্য লোক—ডাক্তার বাবু বড় লোক। কিন্তু আমি সে ভয় করি না। আমার বাবুরা সুখে থাকুন—তাঁহারা আমার সর্ব্বদা সহায়। আমার দ্বারা যতদূর হইতে পারে, আমি ততদূর সাহায্য করিতে স্বীকার করিলাম। এখন কিরূপে সন্ধান লইবেন, বলুন।"

তখন কামিনী নানাপ্রকার পরামর্শ ব্যক্ত করিল, অনেক কাঁদিল এবং আপনার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক বর্ণনা করিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রাধারমণ চলিয়া গেল। রাধারমণ বাটী আসিতে আসিতে অগ্রপশ্চাৎ অনেক ভাবিতে লাগিল। তাহার চিন্তা, 'কামিনী যে এত কথা বলিল, তাহা মিথ্যা নয় তো? আমাকে ফাঁদাইবার

মতলব নাই তো ?' কিন্তু বাধাবমণ সিদ্ধান্ত কবিল, 'না, কামিনীব কথাব ভাবে মিথ্যার ভাব বুঝা যায না , কামিনীব বাগ সত্য বটে।' তাহার পব আপনাকে আপনি প্রশ্ন কবিল,—'কামিনীব রাগ যথার্থ, কামিনীব বাগেব কাবণ আছে, কামিনীব কথাও সত্য , কিন্তু আমি তাহাতে যোগ দিই কেন ? বামচবণ আমাব প্রতি অত্যাচার কবিযা ছিল বটে, কিন্তু হেমেন্দ্রবাবু তাহাকে অনুরূপ সাজা দিযাছেন। সে কথা এখনও আমাব মনে থাকা ভাল নহে তো। তবে আমি কামিনীর প্রার্থনায তাহাব সহাযতা কবিতে স্বীকাব কবি কেন ?' আবাব আপনিই উত্তব কবিল, 'স্বীকাব কেন কবিব না ? কামিনীব প্রতি বামচ ণ অনেক অত্যাচাব কবিযাছে। কামিনী যতই মন্দ হউক সে যে এখন নিতান্ত অনাথিনী. যাব পর নাই দুঃখিনী তাহাব ভুল নাই। একপ দুঃখিনীর সাহায্য করায দোষ কি ? বামচবণ কতই পাপ করিযাছে, কতই কবিতেছে, আবও কতই করিবে। হেমেন্দ্রবাবু তাহাব যে শাস্তি দিযাছেন তাহাতেও সে জব্দ হয নাই তো ? যদি তাহাকে একটু ভাল কবিয়া চৈতন্য দেওযা যায তাহাতে ক্ষতি কি ? তাহাব পব সরকাবদেব বাটীতে অবশ্যই একটা বিশেষ কাবখানা আছে। যদি তাহা জানিতে পারা যায, তাহা হইলে হযত না জানি কত লোকেব কতই উপকাব হইযা যাইতে পাবে। সেও তো মন্দ নহে।' তাহাব পব বাধাবমণ স্থিব কবিল, 'এ সবকাদেব বাটীব কাণ্ডেব সহিত শবতেব মাব নিরুদ্দেশেব কোন সমন্ধ আছে বোধ হয না। থাকুক আব নাই থাকুক, এ বিষযে যাহা মনে কবিযাছি তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে বামচবণেব কোন অনিষ্ট চেষ্টা আমি সাধ্যমতে কবিব না, ইহাই স্থিব।

— —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরকারদের বাটীর ভূতপূর্ব্ব অধিকারী জনার্দ্দন সরকার রামচরণ ডাক্তারের কিছু টাকা ধারিত। দেনার জন্য ঐ বাটী বিক্রয় হইয়া যায়, এক্ষণে উহা রামচরণের সম্পত্তি হইয়াছে। একবার ওলাউঠা রোগের বড় প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সময়ে জনার্দ্দন সরকার সেই রোগের হস্তে সপরিবারে কালগ্রাসে পতিত হয়। শেষে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা ঘরেই মরিয়া পড়িয়া থাকে। তাহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার লোকটীও ছিল না। এই ব্যাপারের পর হইতে সরকারদের বাটীতে বড় ভূতের ভয় বলিয়া জনরব উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, রামচরণ ডাক্তার বলিয়াছেন যে, তিনি একদিন হঠাৎ ঐ সরকারদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে, বৃদ্ধ জনার্দ্দন সরকার ঘরের দাবায় বসিয়া পাটের দড়ি কাটিতেছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জনার্দ্দন সরকারের ঐ প্রেত-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। রামচরণ ডাক্তার এ কথা সকলের নিকট বিশেষ মাত্রা চড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ স্থলে সরকার বাটীর ভূতের ব্যাপারে অবিশ্বাস করে কাহার সাধ্য? ফলতঃ সরকারদের বাটীর ভূতের ব্যাপারে বিশ্বাস করে না এমন লোক ত কল্যাণপুরে নাইই, নিকটস্থ দুই পাচ খানি গ্রামেও নাই। সরকার বাটীর ভূত যে কেবল রামচরণ ডাক্তার-কেই দেখা দিয়া চুপ করিয়া ছিল এমন নহে। হলা খুড়ো নামক একজন বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষক একদিন দুরদৃষ্ট ক্রমে মাঠ হইতে ফিরিতে রাত্রি করিয়া ফেলিয়াছিল। আহা! গরিব বেচারা পথটা সোজা হইবে মনে করিয়া, সাহস ভরে সরকারদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এখন বলিলে না প্রত্যয় ... হলা খুড়ো

দিব্য চক্ষে দেখিল সরকারদের ঘরের মট্‌কায় একটা ভূত বসিয়া রহিয়াছে। হলাখুড়ো যেই দেখিল ভূত, অমনি ত্রাহি মধুসূদন শব্দে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ভূতও অমনি মট্‌কা হইতে এক লম্ফে মাটীতে পড়িল এবং হলাখুড়োর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল। হলাখুড়োও ছুটে, ভূতও ছুটে—ধরে আর কি? তখন হলাখুড়ো বুদ্ধির কাজ করিয়া অতি দূর হইতে 'রাম দা, রাম দা' বলিয়া পথ-পার্শ্বস্থ এক কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণকে ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িতে লাগিল। এই ডাকাডাকিতেই ভূতের দৌড় কিছু কমিয়া আসিল। এদিকে রামা দা 'কেরে? হলা নাকি?' বলিয়া যেমন বাহিরে আসিল, অমনি হলাখুড়ো দৌড়িতে দৌড়িতে, হাফাইতে হাফাইতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এখন রামা দা উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার তাহার নাম রাম, সুতরাং সেখানে ভূতের দন্তস্ফুট করিবার উপায় নাই। কাজেই ভূতকে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিতে হইল। সরকারদের বাটীতে যে কেবল ভূতই থাকে তাহা নহে,—প্রেতিনীও আছে। নবার মা নামে এক জাঁহাবাজ জেলেনী স্বচক্ষে প্রেতিনী দেখিয়াছে—কেবল দেখিয়াছে নয়—তাহার সহিত ঝগড়াও করিয়াছে। নবার মা একদিন শেষরাত্রে বাজারহাটে মাছ লইয়া যাইতেছিল। কেমন তাহার কুগ্রহ, সে সেদিন অন্যমনস্ক ভাবে সরকারদের বাটীর পার্শ্বস্থ পথ দিয়াই যাইতেছিল। এখন যেমন সে সরকারদের বাটীর কাছে গিয়াছে, অমনি এক ভয়ানক প্রেতিনী নেকড়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল এবং বিকট নাকিসুরে বলিতে লাগিল, 'মাছ দে, মাছ দে, ঘাড় মট্‌কে দেব—মাছ দে!' নবার মার বড় সাহস। তাহার কোমরে আবার লোহার চাবি ছিল, সে সেই চাবিতে হাত দিয়া বলিল, 'আমার কাছে লোহা আছে। আমার ভয় কি? পথ ছাড়।' প্রেতিনী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলই বলিতে লাগিল 'মাছ দে।' তখন নবার মা জোর করিয়া বলিল,—'আরে মলো! পথ ছাড় বল্‌চি—না হইলে 'ইস বটী দিয়া নাক কাটিয়া দিব।'

তবু কি প্রেত্তিনী পথ ছাড়ে? সে কেবলই বলে,—'ঘাড় মট্‌কে দেব—মাছ দে।' তখন নিরুপায় হইয়া নবার মা বলিল,—

"ভূত আমার পুত শাঁখ্‌নি আমার ঝি।
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে কর্‌বি আমার কি?"

রাম লক্ষ্মণের নাম যেমন করা, অমনি প্রেত্তিনী কোথায় যে গেল তাহা আর বুঝা গেল না। কিন্তু পাঁচ পা যাইতে না যাইতে আবার প্রেত্তিনী আসিয়া পথ আগুলিয়া মাছ চাহিতে লাগিল এবং নবার মা আবার ঐ মন্ত্র বলিয়া প্রেত্তিনী তাড়াইল। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ একবার করিয়া প্রেত্তিনী আইসে, আবার নবার মার মন্ত্রের জোরে পলাইয়া যায়—এইরূপে চলিতে লাগিল। প্রেত্তিনী ও নবার মা ঝগড়া করিতে করিতে রূপনগরে গিয়া পৌঁছিল, এদিকে ফরসাও হইয়া আসিল। কাজেই প্রেত্তিনীকে হতাশ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিতে হইল। নবার মার সাহসের জন্য গ্রামস্থ লোক ধন্য ধন্য করে। নবার মা যাহা করিয়াছে তাহার গল্প করিতে হই-লেই লোকের গা ডোল হইয়া উঠে। নবার মা বলিয়াছে যে, সে ভাল করিয়া দেখিয়াছে, প্রেত্তিনীর পা দুখানা একেবারে উল্টা। যাহা হউক, এত বলবান প্রমাণ সত্বে সরকারদের বাটীর ভূতে লোক কোন্ সাহসে অবিশ্বাস করিবে? ভূতে অবিশ্বাস করা দূরে থাকুক যদি দৈবাৎ কোথাও সরকারদের বাটীর নাম উঠে, অমনি নিকটস্থ লোক বলে,—'রাম রাম বল ভাই—ও কথায় কাজ কি?' রাত্রি দূরে থাকুক দিনমানেও কেহ সরকারদের বাটীর নিকটস্থ হইতে সাহস করে না। ইদানীং যে কেহ কখন নিতান্ত কার্য্যানুরোধে সরকারদের বাটীর কাছ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে সেই বলিয়াছে যে, সরকারদের ঘরের মধ্যে মানুষের কোঁতানি শব্দ, অথবা নাকি সুরে ক্রন্দনের শব্দ স্পষ্ট শুনা গিয়াছে। এ নিশ্চই প্রেত্তিনীর কার্য্য।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারি দিকে নিতান্ত অন্ধকার, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। দুইটা লোক এইরূপ সময়ে এই

নিদারুণ সরকার বাটীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কথায় কথা বার্ত্তা কহিতেছে। লোক দুইটীর এক জন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। তাহারা অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল। সেই সময় সরকারদের ঘরের ভিতর হইতে নিতান্ত কাতর ভাবে ও ক্ষীণস্বরে শব্দ হইল,—'মাগো।'

শব্দ শুনিয়া পুরুষটী বলিল,—

"এ নিশ্চয়ই মানুষের আওয়াজ

স্ত্রীলোকটী বলিল,—

"মানুষই হউক আর ভূতই হউক, আমি ইহার তত্ত্ব না লইয়া ছাড়িব না।"

"বড় শক্ত কথা। তত্ত্ব লইবার উপায় কি?"

স্ত্রীলোকটী উত্তর দিল,—

"শক্ত কেন? ঘরের এদিকে জানালা আছে জান? সেই জানালা দিয়া খোঁজ লইব।"

"জানালা তো আছে, উঠিবে কেমন করিয়া? যে অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না. জানালা কোথায় তাহা তো বুঝা যাইতেছে না।"

"উঠিব? পার্শ্বের বেড়া হইতে দুই খান বাঁশ তুলিয়া আনি দাঁড়াও। তাহা দিয়া উঠা যাইবে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ হইতেছে, সেই আলোকে জায়গা ঠিক করিয়া লইব।"

পুরুষ আর কথা কহিল না। সে বুঝিল, তাহার অপেক্ষা এ নারীর উৎসাহ অনেক অধিক। স্ত্রীলোক যাহা বলিয়াছিল সে তাহা করিল। সে অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে দুই খানি বাঁশ সংগ্রহ করিয়া আনিল। তখন পুরুষ আবার বলিল,—

"ইহাতেই বা উঠিবে কি রূপে? চাচা বাঁশ—পা দিবে কোথায়?"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"তা বটে।..তাহারও একটা উপায় করিতেছি।"

এই বলিয়া স্ত্রীলোক আবার প্রস্থান করিল। অনতিবিলম্বে চারি পাঁচখানি কাঠের কচা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বলিল,—

"এই লও, ইহাতে উঠিবার উপায় হইবে।"

এখন ঘরের মধ্য হইতে আবার শব্দ হইল,—

"ভগবান্! আর কত দিন এমন করিয়া যন্ত্রণা সহিব?"

গৃহ মধ্যস্থ বক্তা মানবই হউক, প্রেতাত্মাই হউক তাহার স্বর কাতরতা ও ক্ষীণতায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোক গৃহ মধ্যস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"ভয় নাই—তোমার দুঃখের শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা আত্মীয়।"

গৃহমধ্যস্থ লোক অতি কষ্টে বলিল,—

"কি শুনিলাম? তোমরা মানুষ! মানুষে এমনি করিয়া কথা কহে বটে!"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"আমরা মানুষই বটে, তোমার অত কষ্ট করিয়া চেঁচাইয়া কথা কহিতে হইবে না। তোমার কাছে যাইবার চেষ্টা করিতেছি।" তাহার পর পুরুষের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"দেখিতেছ কি? বাঁধ—কাঠ গুলা শীঘ্র বাঁশের সঙ্গে বাঁধ। কথার স্বর শুনিয়া বুঝিতেছ, ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক। বানচরণ—নরাধম, তোমার সর্বনাশের আর দেরি নাই। বাঁধ, বাঁধ, শীঘ্র বাঁধ।"

পুরুষ বলিল,—

"বাঁধিব কেমন করিয়া? কি দিয়া বাঁধি?"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"তাইত।"

এই বলিয়া পুরুষের স্কন্ধ হইতে তাহার চাদর খানি তুলিয়া লইল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার মাঝ খানে লম্বালম্বি ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ছিন্ন অংশদ্বয় পুরুষের হস্তে দিয়া বলিল,—

"বাধ, বাঁধ—এই দিয়া বাঁধ। আরও দিতেছি।"

তাহার পর স্ত্রীলোক আপনার বস্ত্রের উভয় দিকের পাইড় ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহা পুরুষের হস্তে দিয়া বলিল,—

"কেমন ইহাতে হইবে তো?"

পুরুষ বলিল,

"যথেষ্ট।"

বাঁশের সহিত কাঠ একত্র করিয়া বাঁধা হইল। তাহার পর উভয়ে মিলিয়া তাহা ধরাধরি করিয়া যথাস্থানে লাগাইল। তাহার পর স্ত্রীলোকটী তাহার উপর দিয়া উঠিয়া জানালার সমীপস্থ হইল। জানালা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক কৌশল করিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল স্ত্রীলোক সেই বাঁশের উপর দাঁড়াইয়া গৃহমধ্যস্থা স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিল। সে সময়ে সময়ে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম সহানুভূতি পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্ত্রীলোক গৃহমধ্যস্থা কামিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আসিবার সময় সে বলিয়া আসিল,—

"মা, আজি হইতে তিন দিবসের মধ্যে তোমার মুক্তি নিশ্চিত জানিবে।"

তাহার পর স্ত্রীলোক নীচে নামিয়া পুরুষের সাহায্যে বাঁশ কাঠ ইত্যাদি সরাইয়া ফেলিল। সে সমস্ত বিদূরিত হইলে পুরুষ ও স্ত্রীলোকে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে এই পুরুষ রাধারমণ এবং এই স্ত্রীলোক কামিনী।

মা ও মেয়ে।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে বৃহৎ ভবন-দ্বারে শরৎকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল এবং যেখানে দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সুদূর-বিস্তৃত সৌধের অন্তঃপুর মধ্যে একতম প্রকোষ্ঠে শরৎকুমারী বসিয়া আছেন। যে প্রকোষ্ঠে শরৎকুমারী উপবিষ্টা তাহার আয়তন বৃহৎ এবং তাহার সুন্দররূপে সজ্জিত। তাহার জানালা ও দরজার সাসীর গায় নানাবর্ণের নানাপ্রকার সুন্দর ফুল অঙ্কিত। তাহার বারান্দায় দেশী ও বিলাতী ফুল ও পাতার গাছ। ঘরের ভিতর বৃহৎ বৃহৎ তৈলবর্ণে দেশীয় চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত নানাপ্রকার হিন্দু দেব-দেবীর চিত্র লম্বিত। গৃহ মধ্যে দুগ্ধফেননিভ-শয্যা-সমাচ্ছাদিত অতি সুন্দর খট্টা। একটী আলমারিতে কতকগুলি পুস্তক, একখানি টেবিলের উপর নানাবিধ কাগজ কলম ইত্যাদি, এবং কয়ের খানি গদি আঁটা চেয়ার ঘরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। ভিত্তি-গাত্রে একখানি সুন্দর ঘড়ি

অবিশ্রান্তভাবে স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই ঘরের মধ্যে শরৎ বসিয়া আছে।

শরৎকুমারী সেই মূর্চ্ছার পর হইতেই এই বাটীতেই আছে। এখানে কেন? এখানে না থাকিয়া শরৎ আর কোথায় যাইবে? রূপনগরের দীননাথের বাটী তাহার একমাত্র আশ্রয় স্থান। কিন্তু সেখানে শরৎ আর যাইবে না, শরতের জন্য তাঁহারা যে জন-সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকিবেন, ইহা শরৎ প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিবে না। এই তো প্রধান কথা। তাহার পর গৃহস্বামী হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার মহাশয়ের যত্ন, তাঁহার পত্নীর স্নেহ এবং সর্ব্বোপরি দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অনুরোধ শরৎ ছাড়ায় কেমন করিয়া? শরৎ এখানেই থাকিল—তাহাকে থাকিতেই হইল। আগ্রহে ও অনুপায়ে তাহাকে এই স্থানেই থাকিতে হইল। আর শরৎ থাকিল—যে দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়কে তাহার আত্মা স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে শিখিয়াছে, সেই দেবেন্দ্রনারায়ণকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে বলিয়া। ঐ লোভ—এ আশা বালিকা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? বালিকা এখানেই থাকিয়া গেল। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস করিতে করিতে ক্রমে আট মাস কাটিয়া গেল।

বালিকা শরতের মূর্চ্ছার পর যখন প্রথমে জ্ঞানোদয় হইল এবং যখন দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি সকলে তাহার এবম্বিধ অবস্থার ও হঠাৎ এ স্থানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বালিকা কোন কথাই প্রচ্ছন্ন করিল না। প্রচ্ছন্ন করিতে সে জানে না, সে তাহা করিল না। সমস্ত কথা বলিয়া পিতৃ-মাতৃ-স্থানীয় দীননাথ ও করুণাময়ীর জন্য কাঁদিতে লাগিল। হেমেন্দ্রনারায়ণ তখনই লোক পাঠাইয়া দীননাথকে শরতের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইয়া পাঠাইলেন। সেই দিনই রাত্রে দীননাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শরতকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত অনুরাগ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু

হেমেন্দ্র নারায়ণ কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, অতি সৎপাত্রে বালিকার বিবাহ দিয়া তাহার পর তাহাকে রূপ-নগরে পাঠাইবেন।

বালিকা বর্ত্তমান অবস্থায় বড় সুখে আছে। দীননাথের সহিত প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হয় এবং করুণাময়ীর সহিতও প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটে, সুতরাং সে সম্বন্ধে তাহার আর উদ্বেগ নাই। তাহার পর সকল সুখের উপর সুখ—দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়। সেই স্বর্গের দেবতা তাহাকে বড় আদর করেন, বড় স্নেহ করেন, বড় দয়া করেন, বড় অনুগ্রহ করেন। বালিকার হৃদয়ে এ সুখ, এ আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেই দেবতা তাহার জন্য সতত ব্যস্ত। তাহার মনের অপার আনন্দ হেতু দেহ ও মন স্ফুর্ত্তিযুক্ত, তাহার লোচন-যুগল উৎফুল্ল, তাহার বদন-মণ্ডল প্রদীপ্ত, তাহার সর্ব্ব শরীরে লাবণ্যে ঢল ঢলিত। পিতার মৃত্যুর পর বালিকা এত সুখ কখন জানিতে পারে নাই।

শরৎকুমারী সেই গৃহ মধ্যস্থ একখানি চেয়ারে স্বর্গ-কন্যার ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে। তাহার পরিধানে সুচিক্কণ শুভ্র বস্ত্র, তাহার হস্তে স্বর্ণচূড়, কণ্ঠে সৌবর্ণ চিক, কর্ণে হৈম দুল। যৌবনোন্মুখী, বিকসিতাঙ্গী শরৎকুমারীকে সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা বলিয়াই মনে হইতেছে।

শরৎকুমারী নিষ্কর্ম্মা ভাবে বসিয়া নহেন। তাঁহার হস্ত ও মন একটী মখমলের টুপির উপর নানাবর্ণের রেশমি সূতার ফুল তৈয়ার করিতে নিযুক্ত। আজি চারিদিন হইল দেবেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতা হইতে একটী মখমলের টুপি আনাইয়াছেন। ঐ টুপিতে রেশমি সূতার নানা প্রকার ফুলকাটা ছিল। টুপিটী দেখিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং পুনঃপুনঃ শিল্পীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। শরৎকুমারী তাহা শুনিয়াছিল। সে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিল্পকার্য্য যুক্ত টুপি তৈয়ার করিবার অভিপ্রায়ে দেবেন্দ্র-নারায়ণের অজ্ঞাতসারে তাঁহারই একটী সাদা টুপি লইয়া নানা বর্ণের রেশমী সূতা সংগ্রহ করি । দেবেন্দ্রনারা ণ, নাম যুক্ত ফুল

আরম্ভ করিয়াছে। কাজ প্রায় অর্দ্ধাধিক সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। শরৎ একাগ্রচিত্তে এই কর্ম্মে নিযুক্তা রহিয়াছে।

ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র শরতের চিত্ত টুপি, ফুল, সূতা ইত্যাদির কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। টুপিটীর কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহা তাঁহাকে শিল্পীর পরিচয় না দিয়া দেখাইতে হইবে বলিয়া যে সংকল্প ছিল, তাহাও সে ভুলিয়া গেল। তাহার হাতের টুপি হাতেই রহিল। সে মহানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রনারায়ণ তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"দেখি তোমার হাতে কি? বাঃ এ বেশ যে। দেখি দেখি।"

তখন শরৎ বুঝিল যে টুপিটা লুকান হয় নাই। বলিল,—

"ও কিছু নয়। দিন; ও দেখতে হইবে না।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"একি তোমার হাতের ফুল? কি চমৎকার। তুমি সূচীকর্ম্মে এত নিপুণা। কলিকাতা হইতে যে টুপি আনাইয়াছি ইহার সঙ্গে তো তাহার তুলনাই হয় না!"

শরৎকুমারী বদন বিনত করিয়া বলিল,—

"আপনাকে দেখাইবার জন্য আমি উহা করি নাই। আপনার উহা দেখিতে হইবে না। আপনি এখানে এখন কেন আসিলেন?"

হাসিতে হাসিতে দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"আমি আসিয়াছি বলিয়া তুমি রাগ করিতেছ, আচ্ছা আমি চলিয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু দুই পদ পশ্চাৎদিকে সরিয়া আসিলেন।

বালিকা ধীরে ধীরে বলিল,—

"আচ্ছা—যান।"

তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ আবার শরতের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"তুমি আমাকে যাইতে বলিলে বটে, কিন্তু আমি যাইব না; আমি

জোর করিয়া এখানে বসিয়া থাকিব, যদি বড় রাগ করিয়া থাক, তবে আমাকে তাড়াইয়া দিতে পার তো তাড়াইয়া দেও।"

এই বলিয়া তিনি একখানি চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। শরতও আনন্দোৎফুল্ল অথচ বিনম্র বদনে উপবেশন করিলেন। ভাষা অপূর্ণ, ক্ষীণ ও সীমাবদ্ধ। ভাষার সাহায্যে তাহাদের সেই পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ, অসীম ও অনন্ত ভাব সমূহ কখনই ব্যক্ত হইতে পারে না। তাঁহারা উপবেশন করিলেন কিন্তু কথা কহিতে সাহস হইল না। কি জানি কি বলিতে কি বলিব? কি জানি, বলিতে গিয়া যদি মনের প্রকৃত বক্তব্য বলিয়া উঠিতে না পারি, এই বিষম আশঙ্কা। উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"শরৎ, বিশেষ প্রয়োজন হেতু আমাকে কল্য কলিকাতা যাইতে হইবে। আমার চারি দিন কাল বিলম্ব হইবে। এ চারি দিন তুমি আমাকে মনে করিবে কি?"

শরৎ বলিল,—

"মনে করিব কি না, জানি না। আপনি কলিকাতায় যাইতে পাইবেন না।"

দেবেন্দ্র নারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,-

"তুমি যদি আমাকে মনেই না কর, তবে আমি যাইতে পাইব না কেন?"

শরৎ গম্ভীর ভাবে বলিল,—

"প্রায় একবৎসর আমি এখানে আছি। আপনি ইহার মধ্যে একদিনও আমাকে ফেলিয়া কোথাও যান নাই তো। তবে আজি আমাকে কেন ফেলিয়া যাইবেন। আমি দুঃখিনী, আমি অনাথিনী। আপনি আমাকে সে সকল ভুলাইয়া দিয়াছেন। আমি এখন আপনার কৃপায় পরম সুখী। আপনি আমার সাহস বাড়াইয়াছেন। সেই সাহসবলে আমি বলিতেছি, আপনি যাইতে পাইবেন না।"

শরৎকুমারীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন দেবেন্দ্র-নারায়ণ বলিলেন,—

'না শরৎ, আমি যাইব না। কি জানি কেন, তোমাকে দেখিতে পাইব না এ চিন্তা আমার অসহ্য। তোমার জন্য আমার যত ভাবনা তোমার ভাবনা তাহার অনুরূপ কি না, তাহা দেখিবার জন্যই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম। আমি যাইব না, স্থির করিলাম। আমার যে প্রয়োজন তাহা পত্রে লিখিয়া দিলেও চলিবে। আমি তাহাই করিব।"

শরতের বদন-মণ্ডল প্রফুল্ল হইল। দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"শরৎ, আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

শরৎ বলিল –

"এত শীঘ্রই যদি যাইবেন, তবে আসিলেন কেন?"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"আমি যে কে, একটু অবসর পাইলেও এখানে ধাবিত হই কেন, তাহার উত্তর কি জানি না। যাহা হউক, তুমি সারাদিনই এই ঘরটীতে বসিয়া থাকিবে—শরীর খারাপ হইবে যে, চল মার কাছে যাই।"

শরৎ বলিল,—

"আমি টুপিটা না সারিয়া যাইব না।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"টুপি অন্য সময়ে করিও। নিয়ত এককর্ম্ম করা ভাল নয়। চল, মার কাছে যাই।"

শরৎ ও দেবেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিবস বেলা চারিটার সময় শরৎকুমারী পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকোষ্ঠ-মধ্যে সেই খট্টার উপর অধোবদনে শয়ন করিয়া রোদন করিতেছে। শরৎকুমারী রোদন করিতেছে কেন? তাহার সুখময় জীবনে কি বিষাদ-মেঘ সহসা সমুদিত হইল? বিষাদ শরতের রোদনের কারণ নহে। আপনার প্রেমমত্ত হৃদয়বেগ সংযত করিতে না পারিয়া বালিকা রোদন করিতেছে, দুরাশা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে বলিয়া বালিকা কাঁদিতেছে, উচ্চ—উচ্চ—অতি উচ্চ দেবেন্দ্রনারায়ণকে সে কোন্ সাহসে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে বলিয়া কাঁদিতেছে। বালিকা হৃদয়কে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে। নির্ব্বোধ! তাহা কি আর হয়? সে সাবধানতার সময় অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। শরৎ এখন বুঝিয়াছে যে, সে এখন এই প্রেমের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছে এবং তাহার জীবন ও মরণ এই প্রেমের পরিণামের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই বালিকা কাঁদিতেছে।

দেবেন্দ্রনারায়ণ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বালিকার মন বড়ই চিন্তামগ্ন, সে তাহার আগমন জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। দেবেন্দ্রনারায়ণ ক্রমে আসিয়া খট্টার সমীপে দাঁড়াইলেন, তখনও বালিকা কিছুই জানিতে পারিল না। দেবেন্দ্র নারায়ণ বুঝিলেন, শরৎ ক্রন্দন করিতেছে। সভয়ে বলিলেন,—

"শরৎ, একি?"

শরৎ ব্যস্ততাসহ উঠিয়া বসিল। সে যে ক্রন্দন করিতেছিল, তাহা লুকাইবার আর সময় বা সম্ভাবনা নাই। সে তাহা না পারিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের মুখের প্রতি চাহিল এবং সেই দেবকান্তি নয়নে পড়িবামাত্র আরও অধিক কাঁদিয়া ফেলিল। বালিকা দুই হস্তে

বদন ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার সেই নবনীত বিনির্ম্মিত অঙ্গুলির মধ্য দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু-প্রবাহ বহিতে লাগিল। দেবেন্দ্র নিতান্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—

"বল,—বল শরৎ, কি হইয়াছে—কেন কাঁদিতেছ?"

তখন শরতের হৃদয়ের উদ্বেজিত ভাব সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল এবং সে কাঁদিতে কাঁদিতে বেগে আসিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের পাদমূলে নিপতিতা হইল এবং বলিল,—

"আমাকে ক্ষমা করুন। আমি দুঃখিনী, আমি নিরাশ্রয়া, আপনি আমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। আমি আপনার সহিত তাহার মত ব্যবহার করিতে পারি নাই, আমাকে ক্ষমা করুন—আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন, অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে শরৎকুমারীকে উঠাইয়া বলিলেন,—

"শরৎ, তোমার দোষ? তোমার কোন কার্য্যেই তো আমি দোষ দেখিতে পাই না। তোমার ব্যবহার অপূর্ব্ব মধুরতায় মাখা, স্বর্গীয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। কেন শরৎ,—কেন তুমি কাদিতেছ? তোমার মনে আজি কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। বল আমাকে, আমি প্রতিকারের চেষ্টা করি। দোষের কথা বলিও না—তোমার চরিত্রে কোন দোষ সম্ভাবনার অতীত কথা।"

শরৎ বলিল,—

"এবার আমার দোষ ঘটিয়াছে, হে হৃদয়-দেবতা, আজি তোমার নিকট আমি অপরাধিনী হইয়াছি। দেবেন্দ্র বাবু, হৃদয় সর্ব্বস্ব, আমি আপনাকে প্রাণের প্রাণ হইতে ভাল বাসিয়াছি। এ পিতৃ-মাতৃ-হীনা, নিরাশ্রয়া অভাগিনীর এ দুরাশা অমার্জ্জনীয়। করুণাময় দেবেন্দ্র বাবু, আপনি আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, আজি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি যথাসাধ্য যত্নে হৃদয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সে তাহা বুঝে নাই। আমি প্রাণকে

বারম্বার এ দুরাশার পথ হইতে ফিরিতে বলিয়াছি কিন্তু কেহই আমার কথা শুনে নাই। আমি ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই—আর ফিরিতে সাধ্য নাই। আমার বিষম অপরাধ হইয়াছে বটে কিন্তু লুকান অপরাধ বড় ভয়ানক জানিয়া, হে করুণাময়, আজি মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলাম। দুঃখিনীর আশ্রয়, বিপন্নবান্ধব দেবেন্দ্র বাবু, আমি আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি; ভাবিবেন না যে, আমি আপনার নিকট হইতে সমান পরিমাণ ভাল বাসার আশা করি। না না দেবেন্দ্র বাবু, আমার উন্মত্ত দুরাশা তত কাণ্ডজ্ঞানহীন নহে। আমার আশা নিতান্ত সীমাবদ্ধ—নিতান্ত অল্পে সন্তুষ্ট। আপনাকে দেখিতে পাইলেই আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি। দেবেন্দ্র বাবু, আপনি বিবাহ করিয়া সুখের সংসার পরমসুখে কাটাইতে থাকিবেন। আমি দুঃখিনী কেবল নিকটে থাকিয়া আপনাকে দেখিব, আপনার সুখময় জীবন দেখিব। তাহাতেই আমার আশার চরম তৃপ্তি হইবে। তাহার অপেক্ষা অধিকতর সুখ, আমি আর জানি না—চাহি না। দেবেন্দ্র বাবু, দয়াময়, আমার যাহা অপরাধ তাহা আপনাকে জানাইলাম। আপনার চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছি—আমাকে গৃহ-বহিষ্কৃতা করিয়া দিবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন।"

আবার বালিকা দেবেন্দ্রনারায়ণের চরণ ধারণ করিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ নীরবে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহাতে তখন তিনি নাই। তিনি কল্পনায় শরৎকুমারীর প্রণয় লাভ করিয়া যে যে সুখময় বিষয়ের ধ্যান ও চিন্তন করিয়াছিলেন, যে শরৎকুমারীকে স্বীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়া তিনি প্রতিনিয়ত প্রেমার্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন, এবং আপনাকে অত্যন্ত হীন ও শরৎকুমারীকে নিতান্ত উচ্চ জ্ঞানে যিনি শরতের সম্মুখে কদাচ প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহসী হন নাই, আজি সেই শরৎকুমারী, সংসারের সার সম্পত্তি শরৎকুমারী, তাঁহারই পদ নিম্নে—তাহার

প্রেমার্থিনী। কি সৌভাগ্য! দেবেন্দ্র তাহাই ভাবিতেছেন। শরতের বদনবিনির্গত এক একটী কথা তাঁহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সুখময় রাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সে সুখের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই আশার অগোচর, অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারীর কথা সমাপ্ত হইল, তখন দেবেন্দ্রের চৈতন্য হইল। তখন তিনি সযত্নে শরৎকুমারীকে তুলিয়া হৃদয়ে লইলেন। বলিলেন,—

"শরৎকুমারি, হৃদয়েশ্বরি! তুমি আমার পদনিম্নে! আমি শয়নে স্বপ্নে, ভ্রমণে ও বিরামে নিয়ত তোমাকে বই আর জানি না। দিবা-রাত্রি কেবল তোমার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আমার চিত্ত কখন অধি-কার করিতে পারে না। কেমন করিয়া তোমাকে পাইব, কিসে তুমি সন্তুষ্ট হইবে, কি উপায়ে তুমি আমাকে অধিক ভাল বাসিবে, এই আলোচনায় আমি নিরন্তর নিযুক্ত। সেই আমার হৃদয়ের দেবী, চিন্তার আশ্রয়, কল্পনার বিষয় শরৎকুমারী অদ্য অতুল প্রেম-পূর্ণ হৃদয় লইয়া আমার নিকট—আমার পদনিম্নে! প্রিয়তমে, আমার হৃদয় সুখে ও আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—কথায় আমি হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম—"

এই বলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ স্বীয় বক্ষমধ্যস্থ শরৎকুমারীর বদনের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, সেই মুদিত-নয়না সুন্দরীর নয়ন-প্রান্ত হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বহিয়া তাহার বক্ষস্থল ভাসাইতেছে। শরৎ কাঁদিতেছে—আনন্দে। এত সুখ, এত আনন্দ সে তো আশা করে নাই। আশার অনেক অতীত—আকাঙ্ক্ষার অনেক অধিক সুখ তাহার আয়ত্ত। আজি সেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বগুণাধার দেবেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে—সেই দুঃখিনী, অভাগিনীকে হৃদয় ভরিয়া ভাল বাসিয়াছেন। যে হৃদয়ের কণিকামাত্র স্থানও সে প্রার্থনা করিতে সাহস করে নাই, সেই হৃদয়ের, আজি সে রাজ্ঞী হইতেছে, আজি সেই দেবহৃদয়ে তাহারই পূর্ণ অধিকার।

দেবেন্দ্র নারায়ণ আবার বলিলেন,—

"দেবি! হৃদয়েশ্বরি! আমি মানব—অতি ক্ষুদ্র, সামান্ত, অকিঞ্চিৎকর মানব, তোমার সহিত আমার তুলনা কদাচ সম্ভব নহে। তবে কেমন করিয়া শরৎ তোমার দয়ার—তোমার অনুগ্রহের পরিশোধ করিব? আমার হৃদয় আমি তোমারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছি—কিন্তু তাহা তো কদাচ তোমার গুণের অনুরূপ পুরস্কার নহে। হৃদয় দান করাই তো যথেষ্ট নহে—শরৎ, আমি তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া সুখী হই। এ ক্ষুদ্র দেবেন্দ্রনারায়ণের ক্ষুদ্র দেহ, মন, প্রাণ শরৎকুমারি তোমারই হস্তে অর্পণ করিলাম,—তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।"

শরতের চিত্ত তখন অপার্থিব সুখ-চিন্তায় নিমগ্ন। তাহার হৃদয়ে তখন কুসুমের সৌরভ, বসন্তের বায়ু, স্বর্গের জ্যোতি, সাগরের গাম্ভীর্য্য, শূন্যের অসীমতা, ভাবের নিস্তব্ধতা, কল্পনার সূক্ষ্মতা, তাড়িতের ক্ষিপ্রতা, এবং হিমাদ্রির উচ্চতা সকলই সমভাবে বিরাজ করিতেছে। এই সর্ব্ববিধ ব্যাপারের সংমিশ্রণে সে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তির আবির্ভাব হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে সমশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইলে পদার্থ যেমন একস্থানে স্থির হইয়া থাকে, শরৎকুমারীর হৃদয় অধুনা সেইরূপ স্থির ও নিশ্চল। দেবেন্দ্রনারায়ণ আবার বলিলেন,—

"বল দেবি, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া সন্তুষ্ট হইবে কি? এই নগণ্য ক্ষুদ্র হৃদয়কে তুমি ঘৃণা করিবে না? শরৎকুমারী, স্বর্গবালা, তোমার হৃদয়ে স্থান পাইতে আমার সাহস নাই। তুমি দয়া করিয়া এই অনুপযুক্ত পাত্রে হৃদয় দিবে কি?"

মুদিতনয়না শরৎকুমারী একবার নয়ন মেলিয়া চাহিল। সেই চক্ষুতে কত কথা, কত হাস্য, কত আনন্দই ব্যক্ত করিল! ভাষার সাহায্যে, কথার দ্বার দিয়া, তাহার অপেক্ষা অধিক ভাব বাহির হইতে পারিত কি?

সেই দিন সেই স্থানে এই যুবক যুবতী হৃদয়ের বিনিময় করিলেন এবং পরস্পরের নিকট আত্মোৎসর্গের বিধান করিলেন। সংক্ষেপতঃ সেই দিন তাঁহাদের হৃদয়ের বিবাহ হইয়া গেল। সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে তাহা দেহের বিবাহ। হৃদয়ের বিবাহ এ পতিত সমাজে নিতান্ত দুর্লভ সামগ্রী। এ স্থলে সেই আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল।

বালিকে, শরৎকুমারি! আজি বহু কাল পরে তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, বল দেখি, এ সংসার সুখের কি দুঃখের রাজ্য? আজি আর তোমার মরিতে সাধ যায় কি? এ সংসারকে বিষাদের পুরী বলিয়া এখন তোমার মনে হয় কি? তোমাকে তখনও বলিয়াছিলাম, এখনও আবার বলিতেছি, এ বিপদ-ব্যাধি-বিদলিত জীবনে ধৈর্য্যই একমাত্র ঔষধ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা ৮টা। সুবৃহৎ রায়-ভবনের একতম নিভৃত প্রকোষ্ঠে হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় ও একজন সন্ন্যাসী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, বিশাল উরস্ ও সুতীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় দেখিলেই তাঁহাকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির আধার বলিয়া বোধ হয়। হেমেন্দ্রের বয়স যতই ক্রমশঃ উর্দ্ধ সীমার নিকটস্থ হইতেছে, ততই স্বভাবতঃ স্পৃহা-শূন্য হেমেন্দ্র নারায়ণ ধর্ম্মালোচনায় অধিকতর নিবিষ্টমনা হইয়া উঠিতেছেন। বিশেষতঃ, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বিষয়-ব্যাপার এরূপ সুনির্ব্বাহিত করিতে সক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহার এক্ষণে তৎসংক্রান্ত চিন্তার কোনই প্রয়োজন নাই।

যে সন্ন্যাসী গৃহ মধ্যে বসিয়া আছেন হেমেন্দ্র নারায়ণ নায় তাঁহাকে

অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। হেমেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে বড় ভাল বাসেন বলিয়া সন্ন্যাসী সময়ে সময়ে এ অঞ্চলে আসিলেই হেমেন্দ্র-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। আজি চারি দিন হইল তিনি ঐরূপ উপলক্ষে এস্থলে সমাগত হইয়াছেন। এ কয় দিন সন্ন্যাসীর সহিত নিরন্তর নানাবিধ সামাজিক,পারত্রিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় হেমেন্দ্রনারায়ণ পরমানন্দে কাল কাটাইতেছেন।

তাঁহারা উক্তরূপ প্রসঙ্গ বিশেষের আলোচনায় রত রহিয়াছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হেমেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহ?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,—

"আজ্ঞে, না?"

তাহার পর দেবেন্দ্রনারায়ণ ভক্তি ভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সন্নিহিত আসন বিশেষে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাকে স্নেহময় ভাবে আপ্যায়িত করিলেন।

তাহার পর হেমেন্দ্রনারায়ণ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"হাঁ—তাহার পর আপনি যে বলিতেছিলেন, সমাজ যাহা পাপ বলিয়া মনে করে তাহা পাপ বলিয়া ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বেশ কথা। কিন্তু সকল ঘটনায় এ কথা কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? যে স্থানে যুক্তি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সমাজ না জানিয়া কোন ব্যক্তিকে পাপী বলিয়া স্থির করিতেছে, সে স্থলে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সেই নিষ্পাপ ব্যক্তিকে পুনরায় গ্রহণ করা উচিত নহে কি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"সমাজ যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি সমাজের সেই ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে পারেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে, সমাজ কিছুতেই বুঝিবে না, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই সেই সমাজের মতে চলিতে বাধ্য।"

হেমেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

"আপনাকে একটী দৃষ্টান্ত দেখাই। আমার এই বাটীতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা গুণবতী ও রূপবতী একটি বালিকা আছে। ঐ বালিকার বিধবা মাতা বহুদিন হইতে নিরুদ্দেশ। লোকে অনুমান করে সে ব্যভিচারিণী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। এ কথার কোনই প্রমাণ নাই। আপনি কি বলেন, এই অমূলক কথার জন্য ঐ কন্যা চিরদিন সমাজে পতিতা থাকিবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"অবশ্যই থাকিবে। সামাজিক নিয়ম নিতান্ত কঠোর হইলেও তাহার অন্যথাচরণ করা পাপ।"

হেমেন্দ্রনারায়ণ আবার বলিলেন,—

"ঐ কন্যা যেরূপ বিদ্যাবতী, গুণবতী তাহাতে তাঁহাকে পুত্রবধূ করিতে পাইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। আমি যদি তাহাই করি তাহাতে দোষ কি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"তাহাতে মহাদোষ। আপনার সামাজিক শাসনের অন্যথাচরণ করা হইতেছে।"

হেমেন্দ্র। আমি যদি চেষ্টা করিয়া সমাজকে বুঝাইয়া দিই যে, এ বিষয়ের সমাজ যাহা স্থির করিয়াছে, তাহা ভুল।

সন্ন্যাসী। তাহা করিতে পারিলে, এ কার্য্যে আর পাপ নাই।

হেমেন্দ্র। আর যদি আমার সমাজের মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকে যে, আমি যাহা করিব, তাহাই সমাজে নিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা হইলে?

সন্ন্যাসী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"তাহা হইলেও পাপ নাই। আমার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে সমাজে বাস করিতে হইবে তাহার নিয়মাদি, সঙ্গত বা অসঙ্গত হইলেও অবশ্য প্রতিপাল্য। সমাজ মধ্যে যদি এমন ব্যক্তি থাকে, যে

মা ও মেয়ে।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলা ৩টা হইবে, এমন সময় রামচরণ ডাক্তার ধীরে ধীরে পূর্ব্ববর্ণিত সরকারদের বাটীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সতর্কভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর হস্তস্থিত চাবি দ্বারা দরজার তালা খুলিয়া ফেলিল এবং দ্বার খুলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। রামচরণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার সাবধানে ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর সে ঘরের নিকটস্থ হইয়া দাঁড়াইল, এবং ঘরের ভিতর কোন শব্দ হইতেছে কি না উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। তাহার পর হস্তস্থিত আর একটী চাবি দ্বারা ঘরের দরজা খুলিল। ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণস্বরে, ক্ষীণপ্রাণে শব্দ হইল,—"আসিয়াছ? রামচরণ, আসিয়াছ? এখনও মরি নাই! এমন করিয়া কত দিনে মরিব?"

রামচরণ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ও গম্ভীরভাবে থাকিয়া তাহার পর

বলিয়া উঠিল,—"কতদিনে মরিবে তাহা জানি না, কিন্তু তুমি না মরিলেও আমার মন কোন মতেই স্থির হইতেছে না।"

রুগ্না আবার উত্তর দিল,—"কেন রামচরণ—কেন আমাকে এমন গলগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ? আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি চলিয়া যাই। আমার অনাথিনী কন্যা"—

সে কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না। শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। রামচরণ বলিল,—"কেন তোমাকে রাখিয়াছি তাহা কি জান না? কতদিন তো তোমাকে সে কথা বলিয়াছি। তোমাকে আনিয়াছিলাম তোমার রূপ দেখিয়া—তোমার যৌবন দেখিয়া। তোমাকে আনিয়া এখানে তোমার ভাব দেখিয়া আমার সে প্রবৃত্তি হরিয়া গেল, আমার সে বাসনা লুকাইল। দেখিলাম, তুমি কন্যার বিচ্ছেদে পাগলিনী, আর দেখিলাম, তিনদিনের মধ্যেই তোমার সেই অপূর্ব্ব শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমাকে যে জন্য আনিয়াছিলাম সে ইচ্ছা একটুও হইল না। এখন তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়াও মহা দায়। তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বনাশ। তুমি যে স্বাধীন হইলে যেখানে সেখানে আমার অত্যাচার না বলিয়া চুপ্ করিয়া থাকিবে, একথা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করি না। কাজেই আমাকে এই পাপের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বহিতে হইতেছে। এক্ষণে তুমি না মরিলে আমার নিষ্কৃতি নাই।"

গৃহমধ্যস্থা স্ত্রীলোক বলিল,—"আমাকে ছাড়িয়া দেও, রামচরণ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ কথা ইহজগতে আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না।"

রামচরণ বলিল,—"তোমার কথায় বিশ্বাস কি? তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি কি প্রাণে মারা যাইব, মনে করিয়াছ?"

স্ত্রীলোক আবার বলিল,—"তবে কি হইবে রামচরণ? মরণ তো ইচ্ছাযত্ত নহে। আমি তো এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না।

আমাকে কেন অকারণ এত কষ্ট দিতেছ? যদি আমাকে ছাড়িয়া না দেও, তবে দয়া করিয়া কোন উপায়ে আমাকে মারিয়া ফেল। তাহাতে তোমারও উপকার হইবে, আমারও সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে।"

পাষণ্ড রামচরণ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—"কাজেই আমাকে তাহাই করিতে হইবে। এত উপবাস করিয়া, এত কষ্ট ভুগিয়াও যে তোমার কাঠপ্রাণ বাহির হইবে না, তাহা আমি ভাবি নাই। এ দগ্ধানি আমি আর সহ্য করিতে পারি না। এমন কঠোর প্রাণও কোথায় দেখি নাই। বুঝিলাম, তুমি আপনা আপনি মরিবে না। এখন কাজেই তোমাকে জোর করিয়া মারিয়া না ফেলিলে আমার নিস্তার নাই।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তাহাই কর, আমাকে কাটিয়া ফেল। আমি তাহাতে একটুও দুঃখিত বা কাতর নহি। কিন্তু রামচরণ, তোমাকে একটা কথা বলি শুন। ভাবিও না যে, আমি প্রাণের মায়ায় বা মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বলিতেছি। প্রাণ তো আমার দেহ হইতে যাওয়াই সুখ, মৃত্যুই তো এখন আমার পরম সুখ। সেজন্য নহে, রামচরণ। ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা কখন একবারও ভাবিয়াছ কি? নরকের কথা একবারও মনে করিয়াছ কি? মাথার উপর সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর রহিয়াছেন তাহা জান কি, রামচরণ? এখানে তুমি যাহা যাহা করিলে পরকালে তাহার প্রত্যেকটির বিচার হইবে তাহা শুনিয়াছ কি, পাষণ্ড? তোমার সন্তোষ বা ক্রোধ—অনুগ্রহ বা নিগ্রহ আমার পক্ষে এখন উভয়ই সমান। আমি আজি যদি তোমার হস্তে নাও মরি, দুই চারিদিন পরে যে মরিব তাহার ভুল নাই। মরণান্তে যদি আত্মায় আত্মার সাক্ষাৎ হয় তখন দেখিব পাপিষ্ঠ, তোমার পাপ আত্মা নিশ্চয়ই অগ্নিরাশির মধ্যে বিকট চীৎকার করিতে করিতে অনন্তকালের নিমিত্ত দগ্ধ হইতেছে। সে দিন, সে অবস্থা, রামচরণ, একবার স্মরণ কর।"

স্ত্রীলোক নীরব হইল। দুর্ব্বল শরীরে বহুক্ষণ কথা কহিয়া সে কাতর হইয়া পড়িল। রামচরণও নীরব। তাহার চিত্তের তখন ভয়ানক অবস্থা। একদিকে ইহলোকে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা, আর একদিকে স্ত্রীলোক পরলোকের যে চিত্র দেখাইল তাহা ভয়ানকের ভয়ানক। রামচরণের চিত্ত যার পর নাই অস্থির। স্ত্রীলোক আবার বলিল,—"পাপিষ্ঠ রামচরণ, কি ভাবিতেছ? অসীম ভাবনাস্রোতেও তোমার এ পাপ-পর্ব্বত ধৌত হইবার নহে। ভাবিয়া দেখ রামচরণ, আমি একজন দুঃখিনী বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা। আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি রামচরণ, যে তুমি আমাকে এই দুঃসহ যাতনা দিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে আমার জীবননাশ করিতেছ? ইহার কি উত্তর দিবে নরাধম? আমার সেই নিরাশ্রয়া দুঃখিনী 'মা, মা' বলিয়া যত আর্ত্তনাদ করিতেছে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তাহার চক্ষু হইতে যত বিন্দু জল পড়িতেছে, জানিও, সে সমস্তই ভগবানের পুস্তকে লিখিত হইতেছে—তোমাকে তাহার জবাব দিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ রামচরণ, তখন তোমার অবস্থা কি ভয়ানক হইয়া পড়িবে।"

স্ত্রীলোক আবার নীরব। স্ত্রীলোক চিত্রিত চিত্র রামচরণের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। সে দুই একবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে পাষাণহৃদয়ে স্থায়ীরূপে অঙ্কপাত করা অসম্ভব। রামচরণের হৃদয় তখনই অন্য পথে পরিচালিত হইল। সে বলিল,—"আমার ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। তোমার অদৃষ্টে আপাততঃ কি আছে তাহাই ভাবিয়া দেখ।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"আমার অদৃষ্টে আর কি আছে রামচরণ? মৃত্যু—তাহা তো নূতন নহে। কিন্তু আমাকে মারিলেই যে তুমি ইহজগতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে মনে করিয়াছ, জানিও কখনই তাহা ঘটিবে না। আজি হউক বা কালি হউক, এ কথা প্রচার হইবেই হইবে, তখন তোমার অদৃষ্টে কি হইবে?"

রামচরণ বলিল,—"সে ভয় আমাকে দেখাইতে হইবে না। তোমাকে আমি যেরূপ সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাহাতে কাহারও সাধ্য নাই যে একথা জানিতে পারে।"

স্ত্রীলোক একটু হাসির সহিত মিশাইয়া বলিল,—"কিন্তু ঈশ্বরের নিকট লুকাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই জানিবে। সেই অনাথ-নাথ ভগবান আমার এই দশা জানেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই অবরোধের মধ্যেও আমার বন্ধু জুটাইয়া দিয়াছেন। আজি যদি আমি মরি রামচরণ, জানিও, কালি আমার সেই ঈশ্বরপ্রেরিত বন্ধুগণ তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িবেন না। অতএব রামচরণ, তোমার নিষ্কৃতি নাই। আমি মরি বা বাঁচি, তোমার সর্ব্বনাশ সম্মুখে।"

রামচরণ অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বুঝিল যে, স্ত্রীলোকের কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। সে ভয় দেখাইবার জন্য এ কথা বলিতেছে। বলিল,—"রামচরণ কাঁচা ছেলে নহে যে, তোমার ঐ কথা সত্য বলিয়া মনে করিবে। আমাকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় হইবে না।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তোমাকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করিতে চাহি না। যে মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহার কোন কাজেরই দরকার নাই তো। ধর্ম্ম আমার বন্ধুরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, এ কথা মিথ্যা নহে। বিশ্বাস না হয় এই দেখ,"—এই বলিয়া স্ত্রীলোক একটা মিঠাই ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"এ সামগ্রী এখানে কেমন করিয়া আসিল?"

রামচরণের মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিল, তবে তো সত্যই অপর লোকে ইহার সন্ধান পাইয়াছে। ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, এই সর্ব্বনাশস্বরূপিণী স্ত্রীলোককে এখনই বিনাশ করিতে হইবে। তাহার পর উহার শব এমনি করিয়া লুকা-ইতে হইবে যে, ইহজগতে কেহই তাহার সন্ধানও পাইবে না। ইহাকে আর বাঁচিতে দিলে পা'রও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। রাম-

চরণ বলিল,—"সুলোচনা, তোমার আর রক্ষা নাই। তুই যখন আমার সর্ব্বনাশের পথ করিতেছিস্ তখন তোকে আর এক মুহূর্ত্তকালও থাকিতে হইবে না। আজি এক লাঠিতে তোর মাথা ফাটাইয়া অন্য কথা কহিব। দেখি, তোর কোন্ বন্ধু রক্ষা করে।"

এই বলিয়া রামচরণ ঘরের চাল হইতে বাঁশ ভাঙ্গিতে গেল এবং যখন প্রকাণ্ড এক বাঁশ হস্তে সুলোচনার মস্তকচূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহপ্রবেশ করিবে, এমন সময় দেখিল সম্মুখে আলুলায়িতকুন্তলা এক উন্মাদিনী-প্রায় স্ত্রীলোক! রামচরণ প্রথমে অবাক্ হইল, তাহার পর চিনিল, সে স্ত্রীলোক কামিনী। সে কামিনীর অসম্ভাবিত উপায়ে এস্থানে আগমনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, তাহার প্রতি অত্যাচার প্রদর্শন করিবে মনে করিতেছে এমন সময়ে কামিনী বলিল,—"রামচরণ, আজি সেই পদ-বিদলিতা বেশ্যা সম্মুখে উপস্থিত। সে অনেক সহিয়াছে, সে অনেক ভুগিয়াছে, আজি সকল কষ্টের অবসান করিতে সে এখানে আসিয়াছে। ভাবিয়াছ কি ডাক্তার বাবু, হস্তের বাঁশ দিয়া আমায় শাস্তি দিবে? হা হা, তাহা তোমার সাধ্য নহে। অনেক পদাঘাত করিয়াছ, অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ, আজি আর কিছু বলিতে হইবে না। মনে করিয়াছ কি, ঐ স্ত্রীলোককে মারিয়া ফেলিয়া তোমার কলঙ্ক লুকাইয়া রাখিবে? না না, ডাক্তার মহাশয়, তাহা হইবার নহে। তোমার যে পাপ—তোমার যে কলঙ্ক, তাহা লুকাইবার নহে।"

কামিনী নীরব হইল। ক্রোধে তখন ডাক্তারের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার সুলোচনাকে নিপাত করার কথা ভুলিয়া গিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা কামিনীর মাথা বিচূর্ণ করিবার সংকল্প করিল। নিমেষের মধ্যে কামিনী রামচরণের নিকটস্থ হইল এবং তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—

"দেখ দেখি, ডাক্তার বাবু, হৃদয়ে আঘাত লাগে কি না। দেখ দেখি, ও পাষাণহৃদয় বিদ্ধ হয় কি না!"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কামিনী কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিষ্কাশিত করিয়া তাহা রামচরণের হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া দিল। রামচরণ 'মাগো' শব্দে ভূমিতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তখন কামিনী বিকট চীৎকার করিয়া বলিল,—"কি দেখিতেছ—বাহিরে আইস, আজি সকল জ্বালার শেষ করিয়া দিয়াছি।"

ধীরে ধীরে অতি কাতরভাবে এক অস্থিচর্ম্মাবশেষ রমণী-মূর্ত্তি দ্বার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছে তাহারাও দেখিয়া অনুমান করিতে পারে না যে, এই সেই সুলোচনা। সুলোচনা দেখিয়া অবাক্।

তখন আর কোন কথা না কহিয়া বা আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া রামচরণের যাতনাক্লিষ্ট বক্ষ হইতে কামিনী বিদ্ধ ছুরিকা খুলিয়া লইল এবং বলিল,—"রামচরণ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা! ভাবিও না তোমার এই চরণাশ্রিতা দাসী সুখে থাকিবে। দাসী তোমার চরণ ভিন্ন জানে না। ইহজগতে তোমার চরণে স্থান পাইবার আশা নাই দেখিয়া সে আজি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তোমার চরণাশ্রিতা দাসীও তোমার চরণছায়ার অনুবর্ত্তিনী হইল।" এই বলিয়া কামিনী সেই শোণিতাক্ত ছুরিকা স্বীয় বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল এবং হাসিতে হাসিতে রামচরণের দেহের উপর পড়িয়া গেল।

সুলোচনা বাক্যহীনা, সংজ্ঞাহীনা বলিলেও হয়। এ সকল স্বপ্ন না প্রকৃত ঘটনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকের যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে হেমেন্দ্র-নারায়ণ রায়, দেবেন্দ্রনারায়ণ, রাধারমণ এবং তাঁহাদের সমভি-ব্যাহারী আরও কয়েকজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধারমণ অদ্য প্রাতে সুলোচনাসম্বন্ধীয় সংবাদ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কর্ণগোচর করে। তিনি সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব শুভসংবাদ পিতার কর্ণগোচর করেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া লোকজন লইয়া এতদ্বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন—ভয়ানক ব্যাপার! রামচরণ ডাক্তার শোণিতাক্ত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে এবং তাহার বক্ষোপরে সমদশাপন্না এক স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। তখন সুলোচনার প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়া হেমেন্দ্র-নারায়ণ বলিলেন,—'দেখ দেখি দেবেন্দ্র, ইহারা বাঁচিতে পারে কি না?'

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"ইহাদের উভয়েরই আঘাত গুরুতর হইয়াছে। বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বোধ হইতেছে, এই স্ত্রীলোকটা পুরুষটাকে মারিয়া স্বয়ং আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক ইহাদের মুখে জলটল দিয়া একটু শুশ্রূষা করিয়া দেখা মন্দ নহে।"

তখন রাধারমণ জল সংগ্রহ করিয়া আনিল। ধীরে ধীরে বায়ু ও জল প্রয়োগ করিতে করিতে প্রথমে রামচরণের, পরে কামিনীর জ্ঞানোদয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। রামচরণ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল—তখনই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার পর নিতান্ত কাতরভাবে বলিল,—"ওঃ নরক!—কি ভয়ানক—কামিনি—প্রাণে-শ্বরি—প্রাণ যায় যে।"

কামিনীও চক্ষু মেলিল। চক্ষে চক্ষে সে অন্তিমকালে মিলন ঘটিল। রামচরণ আবার বলিতে লাগিল,—"কামিনি—প্রিয়তমে—ওঃ—হায় আগে কেন জ্ঞান হয় নাই!—প্রাণ যে— নরক! কি হইবে—কামিনি প্রাণেশ্বরি—আমাকে ক্ষমা কর। দেখ—আমার বক্ষ দেখ—সেখানে আর কিছুই নাই—কেবল তুমি। হা প্রিয়ে—কামিনি—এখন উপায়—ওঃ মরি—কোথায় তুমি? তোমাকে ছাড়িয়া—ওঃ কোথায় চলিলাম?"

রামচরণ নীরব হইল। কামিনীর চক্ষু দিয়া তখন জল পড়িতেছে। সমবেত লোক সকলের নয়নও জলভারাকুল। সুলোচনার নয়ন দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে।

কামিনী বলিল,—"রামচরণ—প্রাণেশ্বর—হৃদয়দেবতা—জীবন-সর্ব্বস্ব, আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? তুমি কি মনে করিতেছ, তুমি চলিয়া গেলেও দাসী এখানে পড়িয়া থাকিবে? দাসী তোমার সঙ্গেই যাইতেছে—প্রাণনাথ!"

তখন রামচরণ বলিল,—"কামিনি—প্রিয়ে—তোমাকে কত কষ্টই দিয়াছি—তোমার দেবদুর্লভ—আহা—স্বর্গীয় প্রেমের কতই অবজ্ঞা করিয়াছি?— কামিনি—প্রিয়তমে—আমি ক্ষমার যোগ্য নহি—তথাপি—ওঃ—আমাকে ক্ষমা কর।"

কামিনী নীরব। তখন রামচরণ একে একে উপস্থিত লোক সকলের প্রতি নেত্রপাত করিল। ক্রমে তাহার নেত্র সুলোচনার সেই ক্ষীণ মূর্ত্তির সহিত সম্মিলিত হইল। সে নিতান্ত কাতর ও বিপন্ন হইয়া উঠিল। অত্যন্ত ভীতভাবে বলিল,—"ওঃ—নরক—নরক—নরক। কি হইবে?—কি করিব?—নরক—নরক—নরক! সুলোচনা—মা আমার—তোমার এ অক্ষম পাপিষ্ঠ সন্তানের—গতি—না—গতি নাই—নরক! ওঃ—সুলোচনা—মা—আমাকে ক্ষমা—না—অসম্ভব—আমার নরক। আগে বুঝি নাই—পাপ ভাবি নাই—দুষ্কর্ম্মে ডরাই নাই। নরক—নরক—নরক! কিন্তু মা—সুলোচনা

—আমি তোমার সন্তান—আমি তোমার দেহে—ওঃ—তোমার দেহে—জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ—কখন হাত—নাই। তুমি সতী—সাবিত্রী—তোমার আশীর্ব্বাদে—তোমার প্রার্থনার অনেক ফল। কিন্তু—আর বলিতে পারি না। ওঃ মরি যে—একটু জল দিতে পার ?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ রামচরণের বদনে একটু জল দিলেন। সে আবার বলিল,—"কিন্তু তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করিবে কেন? আমি তোমাকে—ওঃ ভাবিলে ভয় হয়—কত কষ্ট দিয়াছি—এমন অধমকে তুমি—ওঃ—আশীর্ব্বাদ করিবে কেন? কিন্তু মা—আমি যতই মন্দ হই—আমি তোমার সন্তান। সন্তানকে অন্তিম কালে ক্ষমা—ওঃ—যাই যে—ওঃ ক্ষমা কর মা।"

ক্ষীণ ও কাতর স্বরে অশ্রুসমাকুল লোচনে সুলোচনা বলিলেন,—"রামচরণ! বুদ্ধির দোষে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়াছ সত্য, কিন্তু আমার দেহ যে তোমার দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই, ইহা আমি পরম লাভ বলিয়া মনে করিতেছি। আমি যে কষ্ট পাইয়াছি সে জন্য আমি এখন একটুও কাতর নহি, জানিবে। তুমি আমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছ। আমিও জননীর ন্যায় তোমার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া পূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

তখন রামচরণ আবার বলিলেন,—"তবে—ওঃ—তবে আইস মা, আমার মস্তকে চরণ—ধূলি দেও মা।" এই বলিয়া রামচরণ হস্ত বিস্তার করিয়া সুলোচনার পাদ-স্পর্শ করিল এবং সেই চরণরেণু স্বীয় মস্তকে সংস্থাপিত করিল। তাহার পর রামচরণ রাধারমণের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রাধারমণ তাহাকে হৃদয় হইতে ক্ষমার আশ্বাস দিল। তাহার পর রামচরণ করযোড়ে হেমেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, "আমার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে। তাহা সম্পূর্ণ—কি বলিব—ওঃ—সৎ পথে অর্জ্জিত হইলে—প্রিয় ভগ্নী শরৎকুমারীকে—দিতাম। তাহাতে কাজ নাই—ঐ সম্পত্তি মহাশয়—কোন হিতকর কার্য্যে—ব্যয় করিবেন।"

সহিত আঘাত করিলেন। অভিমানী বালকের ওষ্ঠাধর তখনই স্ফুরিত হইয়া উঠিল এবং সে স্থলোচনার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্থলোচনা তাহাকে 'না না—কাঁদিতে হইবে না' বলিয়া আদরে বক্ষে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।

সেই সময় পশ্চাতের দ্বার দিয়া এক ভুবনমোহিনী যুবতী সেই বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। যুবতীর সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়। তাহার স্বর্ণকান্তি স্থানে স্থানে হীরকখচিত স্বর্ণ-ভূষণে বিভূষিত। তাহার গাত্রাবরণ জামা ও পরিধান বস্ত্র মহামূল্যবান। যুবতীর কেশ-কলাপ অবেণী-সম্বদ্ধ। যুবতী ব্যস্ততা সহকারে তথায় সমাগতা হইলেন। তাহার অঞ্চল ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা, নরেন্ কাঁদিতেছিল ?"

স্থলোচনা বলিলেন,—

"হাঁ, তোর ছেলে যে দুষ্ট—আমি উহাকে রাখিতে পারি না। নে তুই তোর ছেলে।"

বলা বাহুল্য যে এই সুন্দরী শরৎকুমারী। শরৎকুমারী নিকটস্থ হইয়া হস্ত বিস্তার করিবামাত্র শিশু "মাঃ—মাঃ" বলিয়া শরতের ক্রোড়ে লাফাইয়া গেল। শরৎ ক্রোড়স্থ সন্তানকে আদর করিয়া বলিলেন,—

"দুষ্ট! দিদির সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিস ? দেখিস্, দিদি আর কখন কোলে লইবেন না।"

শিশু অপাঙ্গে স্থলোচনার প্রতি চাহিতে লাগিল। স্থলোচনা বলিলেন,—

"এস, দাদা আমার—চাঁদ আমার—এস।"

শিশু হাসিতে হাসিতে তাহার ক্রোড়ে আসিল। স্থলোচনা বারম্বার তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পদশব্দ হইল। স্থলোচনা বলিলেন,—

---আমি তোমার সন্তান --আমি তোমার দেহে—ওঃ—তোমার দেহে —জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ—কখন হাত—নাই। তুমি সতী—সাবিত্রী —তোমার আশীর্ব্বাদে—তোমার প্রার্থনার অনেক ফল। কিন্তু—আর বলিতে পারি না। ওঃ মরি যে—একটু জল দিতে পার?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ রামচরণের বদনে একটু জল দিলেন। সে আবার বলিল,—"কিন্তু তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করিবে কেন? আমি তোমাকে—ওঃ ভাবিলে ভয় হয়—কত কষ্ট দিয়াছি—এমন অধমকে তুমি—ওঃ—আশীর্ব্বাদ করিবে কেন? কিন্তু মা—আমি যতই মন্দ হই—আমি তোমার সন্তান। সন্তানকে অন্তিম কালে ক্ষমা—ওঃ—যাই যে—ওঃ ক্ষমা কর মা।"

ক্ষীণ ও কাতর স্বরে অশ্রুসমাকুল লোচনে সুলোচনা বলিলেন,—"রামচরণ। বুদ্ধির দোষে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়াছ সত্য, কিন্তু আমার দেহ যে তোমার দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই, ইহা আমি পরম লাভ বলিয়া মনে করিতেছি। আমি যে কষ্ট পাইয়াছি সে জন্য আমি এখন একটুও কাতর নহি, জানিবে। তুমি আমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছ। আমিও জননীর ন্যায় তোমার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া পূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

তখন রামচরণ আবার বলিলেন,—"তবে—ওঃ—তবে আইস মা, আমার মস্তকে চরণ—ধূলি দেও মা।" এই বলিয়া রামচরণ হস্ত বিস্তার করিয়া সুলোচনার পাদ-স্পর্শ করিল এবং সেই চরণরেণু স্বীয় মস্তকে সংস্থাপিত করিল। তাহার পর রামচরণ রাধারমণের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রাধারমণ তাহাকে হৃদয় হইতে ক্ষমার আশ্বাস দিল। তাহার পর রামচরণ করযোড়ে হেমেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, "আমার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে। তাহা সম্পূর্ণ—কি বলিব—ওঃ—সৎ পথে অর্জ্জিত হইলে—প্রিয় ভগ্নী শরৎকুমারীকে—দিতাম। তাহাতে কাজ নাই—ঐ সম্পত্তি—মহাশয়—কোন হিতকর কার্য্যে—ব্যয় করিবেন।"

সহিত আঘাত করিলেন। অভিমানী বালকের ওষ্ঠাধর তখনই স্ফুরিত হইয়া উঠিল এবং সে সুলোচনার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল্। সুলোচনা তাহাকে 'না না—কাঁদিতে হইবে না' বলিয়া আদরে বক্ষে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।

সেই সময় পশ্চাতের দ্বার দিয়া এক ভুবনমোহিনী যুবতী সেই বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। যুবতীর সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়। তাহার স্বর্ণকান্তি স্থানে স্থানে হীরক-খচিত স্বর্ণ-ভূষণে বিভূষিত। তাহার গাত্রাবরণ জামা ও পরিধান বস্ত্র মহামূল্যবান। যুবতীর কেশ-কলাপ অবেণী-সম্বদ্ধ। যুবতী ব্যস্ততা সহকারে তথায় সমাগতা হইলেন। তাহার অঞ্চল ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা, নরেন্ কাঁদিতেছিল ?"

সুলোচনা বলিলেন,—

"হাঁ, তোর ছেলে যে দুষ্ট—আমি উহাকে রাখিতে পারি না। নে তুই তোর ছেলে।"

বলা বাহুল্য যে এই সুন্দরী শরৎকুমারী। শরৎকুমারী নিকটস্থ হইয়া হস্ত বিস্তার করিবামাত্র শিশু "মাঃ—মাঃ" বলিয়া শরতের ক্রোড়ে লাফাইয়া গেল। শরৎ ক্রোড়স্থ সন্তানকে আদর করিয়া বলিলেন,—

"দুষ্ট! দিদির সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিস্ ? দেখিস্, দিদি আর কখন কোলে লইবেন না।"

শিশু অপাঙ্গে সুলোচনার প্রতি চাহিতে লাগিল। সুলোচনা বলিলেন,—

"এস, দাদা আমার—চাঁদ আমার—এস।"

শিশু হাসিতে হাসিতে তাঁহার ক্রোড়ে আসিল। সুলোচনা বারম্বার তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পদশব্দ হইল। সুলোচনা বলিলেন,—

"দেবেন্দ্র আসিতেছেন বুঝি। শরৎ, নে তোর ছেলে নে—আমি যাই।"

নরেন্দ্র আবার জননীর ক্রোড়ে আসিল, তখন সুলোচনা প্রস্থান করিলেন দেবেন্দ্রনারায়ণ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরতের উজ্জ্বল নয়ন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের কথা নয়ন বুঝাইয়া দিল। দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"ছেলে লইয়া সমস্ত দিন যে ব্যস্ত, ও হৃদয়ে এ অধমের একটুও স্থান আছে কি?"

শরৎকুমারী বলিলেন,—

"এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার বটে। কারণ বিষয়টা অনেক ভাবিয়া বুঝিবার কথা বটে।"

তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ শরৎকুমারীর বদনে প্রেমপূর্ণ চুম্বন করিলেন, এবং খোকাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত বিস্তার করিলেন। নরেন্ কিন্তু তাহার কোলে গেল না। জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া মধুর হাসি হাসিল। শরৎকুমারী অঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"কেমন জব্দ। যেও না, খোকা বাবু।"

"আমার প্রতি এ সকল কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা কেন? আমার অপরাধ?"

শরৎকুমারী মনে মনে ভাবিলেন,—"গুণময়, তোমার আবার অপরাধ? তোমার গুণের তুলনা নাই, তুমিতো নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র—স্বর্গের দেবতা।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"অপরাধ নহে কেন? নরেন্ কি তাহা জানে না? প্রাতঃকালে এখনই আসিতেছি বলিয়া বিদায় হইয়া যিনি বারো ঘন্টার পরে সন্ধ্যার সময়ে আসিলেন তাঁহার অপরাধ নয়? যাইও না, খোকা বাবু।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,

"আমার অপরাধ হইয়াছে সত্য। কিন্তু একরূপ অপরাধ আমার আজি নূতন নহে। কার্য্যসূত্রে আমার বহুবার এ সম্বন্ধে কথার অন্যথা ঘটিয়াছে। অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কেন ?"

শরৎকুমারী মনে মনে বলিলেন,—"তোমাকে শাস্তি ? এ প্রাণ তোমার ঐ দেব-চরণে সমস্ত দিন লুটিয়া বেড়ায়। তোমাকে শাস্তি।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"অপরাধ যতই বারে অধিক হয়, ততই তাহার শাস্তি গুরুতর হয়, একথা যিনি এত জানেন, তিনি কি জানেন না ?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন,—

"খোকাবাবু, তুমি কাহারও কথা শুনিও না। এস--সোণা ছেলে—লক্ষীছেলে—যাদু ছেলে—এসতো।"

খোকাবাবু পিতার সোহাগপূর্ণ ক্রোড়ে যাইবার জন্য অভিলাষী হইল। শরৎ, "না যায় না—যাইতে নাই" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টিত রহিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণও নানা প্রকার মধুর সম্ভাষণে খোকাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনারায়ণেরই জয় হইল। খোকা দেবেন্দ্রের ক্রোড়ে গমন করিল। তখন শরৎকুমারী রুষ্টভাবে বলিলেন,—

"আচ্ছা, থাক তুমি—তোমাদের সহিত আমার আড়ি।" শিশুর অস্থির চিত্ত তখনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আবার মাতার ক্রোড়ে আসিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু শরৎ বলিলেন,—

"না—যার কাছে যাইলে সেখানেই থাক। আমি কোলে লইব না।"

শিশু যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইল। দেবেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থির করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা

শরৎকুমারী খোকাকে কোলে না লইয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে খোকা কোলে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সকল বিবাদের শেষ হইয়া গেল।

তাহার পর তাঁহারা তত্রত্য আসনে উপবেশন করিলেন। নব-নীত-পুত্তলী নরেন্দ্রনারায়ণ একবার পিতার ও একবার মাতার ক্রোড়ে যাতায়াত করিয়া খেলা করিতে লাগিল। সুস্নিগ্ধ বাসন্ত বায়ু ধীরে ধীরে তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিতে লাগিল। প্রস্ফুটিত কুসুমা-বলীর সুগন্ধ তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। খোকার স্বর্গীয় শব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহর পবিত্র করিতে লাগিল। প্রেমিকের পার্শ্বে প্রেমিকা এবং প্রেমিকার পার্শ্বে প্রেমিক, উভয়ের মধ্যে প্রেমবন্ধন--নবনীত-পুত্তলী—নয়নানন্দ সন্তান। তাঁহাদের সংসার প্রেমময়, আনন্দময় ও সুখময়!

দম্পতী যখন বাহিরে এই ভাবে উপবিষ্ট তখন প্রকোষ্ঠ-মধ্যে সুলোচনা এক বাতায়ন মুখে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন। এত সুখ, এত সৌভাগ্য, এত আনন্দ! সকলই আশার অতীত; সকলই কল্পনার অগোচর! তাঁহার লোচনে দুই বিন্দু জল—আনন্দের জন্য। সুলোচনা সেই আনন্দের মধ্যে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কোথায় প্রাণেশ্বর, এমন দিনে হৃদয়েশ, তুমি কোথায় রহিলে?" সুলোচনার নয়নে দুই বিন্দু জল—বিষাদ জন্য।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।